# ইউনিট ২: প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় পটভূমি
## Theoretical Background of Administration and Management

### ভূমিকা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি সামাজিক সংগঠন। এই সংগঠনটি নানান বৈচিত্র্যে ভরপুর কারণ এই প্রতিষ্ঠানের এর সাথে পাঁচ-ছয় বছরের শিশু থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ মানুষের কার্যক্রম জড়িত ফলে এর প্রশাসনিক কার্যকলাপ এবং ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াও বেশ কিছুটা সংবেদনশীল এবং জটিল। এই জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাফল্য অর্জন করতে হলে শিক্ষা প্রশাসকদের যুগোপযোগী তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় পটভূমি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে সহজ ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার জন্য এই ইউনিটের বিষয়কে পাঁচটি পাঠে বিভাজিত করা হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠ্যসমূহ:**


পাঠ- ২.১ : কার্যকরী প্রশাসনে প্রেষণা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ভূমিকা
পাঠ- ২.২ : প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদনের ভূমিকা
পাঠ- ২.৩ : শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্তশাসন এবং জবাবদিহিতা
পাঠ- ২.৪ : ব্যবস্থাপনীয় দক্ষতা পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্তৃক অর্জন
পাঠ- ২.৫ : আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন সভা সংগঠিতকরণ সময় ব্যবস্থাপনা, উপস্থাপন, দল গঠন ও চুক্তি

| পাঠ ২.১: | কার্যকরী প্রশাসনে প্রেষণা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের ভূমিকা<br>**Roles of Motivation, Interpersonal Relation and Communication in Effective Administration** |
|---|---|

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় "প্রেষণার" ক্ষেত্রে কর্মীদের চাহিদা নিরূপন করতে পারবেন।
- কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করণের উপায় ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক প্রশাসনে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফলপ্রসূ প্রশাসনে ব্যবস্থাপনার যোগাযোগের ভূমিকার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

## ক. প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা

প্রশাসনে নির্বাহী সহ তার অধঃস্তন কর্মচারীদের কর্তৃক কর্মকান্ড পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠান বা অফিসকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হয়। অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যেকের চাহিদা পূরণার্থে সবাই একত্রে মিলেমিশে কার্য-সম্পাদনে প্রেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## প্রেষণার ধারণা

ইংরেজি 'Motivation' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রেষণা বা অর্থ প্রণোদনা। এটি ল্যাটিন শব্দ 'Mover' থেকে এসেছে। 'To Mover' অর্থাৎ চালনা করা, গতিশীল করা। M. J. Gannon-এর মতে প্রেষণার মূল অর্থ একজন ব্যক্তির প্রয়োজন, আকাঙ্খা এবং ধারণাসমূহ যা তাকে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কাজ করতে উৎসাহ দেয়। ডেসলারের মতে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে কর্মীর প্রেষণা তাঁদের মানসিক চাপ থেকে উৎপন্ন হয় যেখানে এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অসম্পূর্ণ থাকার ফলে অসন্তুষ্টি জন্মে। মনোবিজ্ঞানীগণ প্রেষণার তিনটি উপাদন উল্লেখ করেছেন। প্রেষণার উপাদানগুলো হলো: প্রয়োজন (Needs), তাড়না (Drive), লক্ষ্য (Goals)।

কর্মীর সামর্থ্য থাকলেই কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় নাও দিতে পারেন যদি না তাঁর মধ্যে কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত করা না হয়। তাই বলা যায়, কর্মীদের কর্মদক্ষতা তাঁদের সামর্থ্য ও প্রেষণার সমন্বিত রূপ। আমেরিকার কানেক্টিকাটের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Victor H. Vroom (1964) এ বিষয়টিকে নিম্নোক্ত সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন:

কর্মদক্ষতা (Efficiency) = সামর্থ্য (Ability) × প্রেষণা (Motivation)

## কর্মীদের চাহিদা চিহ্নিতকরণ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কোন না কোন চাহিদা বা অভাববোধ থাকবেই। এ ধরণের চাহিদা দুই ধরণের হতে পারে: (১) আর্থিক, (২) অনার্থিক। প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ থাকে যা কোন সময় এককভাবে আবার কোন কাজ কয়েকজন মিলে বা সকলে একত্রে সম্পন্ন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরণ, বর্তমান ও তাৎক্ষনিক প্রয়োজনও কার্য-সম্পাদনে চাহিদার বিবেচ্য বিষয় হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের যোগ্যতা ও সামর্থ্য এক নয়। ফলে,

কর্মীদের চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের চাহিদা অনুধাবন করে তাঁদেরকে উপযুক্ত প্রেষণা দানের মাধ্যমে সর্বাধিক কাজ আদায় করে নেওয়া। এ বিষয়টি নির্ভর করে কর্মীদের আচরণ, চাহিদা, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও প্রেষণা দানের কৌশলের উপর। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী প্রেষণার চাহিদা অনুধাবনের জন্য বেশ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। নিম্নে চারটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উল্লেখ করা হলো:

১. মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব (Need Hierarchy Theory of Maslow)
২. হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two Factor Theory of Herzberg)
৩. প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্ব (Expectation Theory Motivation)
৪. মেকক্লেলেন্ড-এর চাহিদা তত্ত্ব (McClelland's Theory of Needs)

নিম্নে তত্ত্বগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

### ১. মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব (Need Hierarchy Theory of Maslow)

কর্মীদের অভাব বা চাহিদাগুলোকে মাসলো পাঁচভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে জৈবিক প্রয়োজন ও নিরাপত্তার প্রয়োজনকে তিনি নিম্ন শ্রেণির প্রয়োজন বা মৌলিক প্রয়োজন এবং সামাজিক প্রয়োজন, আত্মতৃপ্তির প্রয়োজন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনকে উচ্চ শ্রেণির প্রয়োজন হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্ন শ্রেণির প্রয়োজনগুলো অর্থ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হলেও উচ্চ শ্রেণির প্রয়োজন বা চাহিদা পূরণ আর্থিক সংশ্লেষ কম বা মোটেই নেই। পিরামিড চিত্রের মাধ্যমে চাহিদাক্রম উল্লেখ করা হলো:

### ২. হার্জবার্গের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two Factor Theory of Herzberg)

ফ্রেডারিক হার্জবার্গ মানুষের কর্ম সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির সঙ্গে জড়িত উপাদানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এ গুলো হচ্ছে: (১) অন্তর্নিহিত বা প্রেষণামূলক উপাদান (Intrinsic Factor or Motivational Factor) এবং (২) বাহ্যিক বা স্বাস্থ্যগত উপাদান (Extrinsic Factor or Hygiene Factor) নিম্নে উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো:

| প্রেষণামূলক উপাদান (সন্তুষ্টি দায়ক) (Motivational Factor) | রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান (Hygiene Factor) (বিধায়ক অসন্তুষ্টি) |
|---|---|
| ১. সাফল্য<br>২. স্বীকৃতি<br>৩. উন্নতি<br>৪. কাজের বৈশিষ্ট্য<br>৫. সমৃদ্ধি সমাধান<br>৬. দায়িত্ব | ১. প্রতিষ্ঠানের নীতি ও প্রশাসন<br>২. কারিগরি তত্ত্বাবধান<br>৩. তত্ত্বাবধানের সাথে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক<br>৪. কর্মীদের সঙ্গে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক<br>৫. অধীনস্থদের সঙ্গে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক<br>৬. বেতন<br>৭. নিরাপত্তা<br>৮. কার্য-পরিবেশ<br>৯. মর্যাদা<br>১০. ব্যক্তিগত জীবন |

হার্জবার্গ-এর মতে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে বেদনা দায়ক অনেক হাইজিন ফ্যাক্টর থাকে যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেতে বা এ গুলির অবসান ঘটাতে পারে। আবার, এ জাতীয় ফ্যাক্টর চক্রাকারে আবর্তনশীল হতে পারে। হাইজিন ফ্যাক্টরের বঞ্চনার কারণে কর্মীর কাজে অসন্তুষ্টি আসে।

### ৩. প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্ব (Expectation Theory Motivation)

আমেরিকার কানেক্টিকাটের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্টর এইচ ভ্রুম ১৯৬৪ সালে প্রত্যাশা তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ কোন কাজ সম্পাদনের আগে উক্ত কাজ শেষে কী পুরস্কার পেতে পারেন তা বিবেচনা করেন। কাজ শেষে কী লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হলে সে কাজের প্রতি তাঁর চাহিদা বেড়ে যায়। তিনি তিনটি ধারণার মাধ্যমে প্রেষনার প্রত্যাশা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। এগুলো হচ্ছে আকর্ষণ, প্রত্যাশা, শক্তি বা একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

শক্তি (Force) = আকর্ষণ (Valence) × প্রত্যাশা (Expectancy)।

### ৫. মেকক্লেলেন্ড-এর চাহিদা তত্ত্ব (McClelland's theory of needs)

David Clarence McClelland-এর তত্ত্বটি ত্রীয় চাহিদা তত্ত্ব (Three Needs Theory) নামেও পরিচিত। চাহিদা তিনটি হচ্ছে কৃতিত্বের চাহিদা (Need for achievement), সম্বন্ধীকরণের/সম্মিলেনের চাহিদা (Need for Affiliation), কর্তৃত্বের চাহিদা (Need for Power)। তাঁর মতে, ৮৬% কর্মীর এ তিন চাহিদার একটি, বা দু'টি অথবা তিনটি বিদ্যমান থাকে। গবেষণায় দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদধারীগণের মধ্যে কর্তৃত্বের চাহিদা ও মধ্যম সারির পদধারীগণের মধ্যে সম্বন্ধীকরণের চাহিদা বেশি দেখা যায়।

## কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যাবলি (Motivational Activities for Employees)

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কোন না কোন অভাব থাকবেই। প্রেষণা ব্যতীত ব্যবস্থাপনার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ আদায় করা সম্ভব নয়। এ জন্য কর্মীদের কর্মে উদ্বুদ্ধকরণে প্রেষণা দান করা জরুরী। কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ কার্যাবলী নির্ধারণের পূর্বে কোন ধরণের উদ্দীপক ব্যবহার কার্যকরী হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

B. F. Skinner-এর মতে কোন কর্ম-সম্পাদন তার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল, যেটিকে বলবৃদ্ধিমূলক উদ্দীপক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফল ভাল হলে কর্মী উক্ত কাজ বা ঐ জাতীয় কাজ পুনরায় করতে আগ্রহী হয়। B. F

Skinner তিন ধরণের বলবৃদ্ধিমূলক উদ্দীপক উল্লেখ করেছেন; (১) ধনাত্মক বলবৃদ্ধিমূলক উদ্দীপক; (২) ঋণাত্মক বলবৃদ্ধিমূলক উদ্দীপক; ও (৩) শাস্তি।

এছাড়াও, Douglas McGregor 1960 সালে মানুষের প্রকৃতি, আচার-আচরণ ও প্রেষণার সম্পর্ক বিবেচনায় X ও Y তত্ত্ব নামে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। X তত্ত্বের অনুমিত ধারণা মতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অলস ও কাজ অপছন্দ করে। তাই, তাকে শাস্তির জয় দেখিয়ে কাজ আদায় করা দরকার। অন্যদিকে, তত্ত্ব মতে মানুষ কাজ অপছন্দ করে না বরং স্বীকৃতি, আত্ম-উন্নয়নের চাহিদা পূরণের জন্য নিজে থেকেই কাজ করে।

কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণে আর্থিক বা অনার্থিক উভয় ধরণের উদ্দীপক যুগপৎ ব্যবহার করে উদ্বুদ্ধ করা যায়। আর্থিক উদ্দীপকগুলো হচ্ছে উচ্চতর বেতন প্রদান, বিভিন্ন ভাতা প্রদান, আবাসন সুবিধা, যাতায়াতের ব্যবস্থা, উৎসব বোনাস, বীমা সুবিধা, চিকিৎসা বা অন্য কোন সেবা অথবা কল্যাণমূলক সুবিধা ইত্যাদি। অধিকন্তু, অনার্থিক উদ্দীপকগুলো হলো পদোন্নতির সুবিধা, চাকুরীর নিরাপত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ, পেশাগত উন্নয়ন, কাজের স্বাধীনতা, প্রশিক্ষণের সুবিধা, যোগ্যতা বা কাজের স্বীকৃতি, উত্তম কর্ম-পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বা সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উৎসাহ প্রদান, কর্ম বৈচিত্রকরণ, পরামর্শমূলক ব্যবস্থাপনা, সহমর্মিতা ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্মীর আনুগত্য, ভালোবাসা, কাজে আন্তরিকতা, অঙ্গীকার (Commitment) ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নির্বাচন ও চাহিদা পুরণের বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হবে। এছাড়া, কোন প্রক্রিয়ায় কর্মীগণ পুরস্কৃত হতে পারেন তা কর্মীর জানার অধিকার আছে এবং তা কর্মীকে আগেভাগে জানালে ভাল ফল ও কাজ আশা করা যায়।

প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন কার্যবলী সংগঠন করতে প্রতিষ্ঠানকে কৌশলী হতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁকে কর্মীদের চাহিদা চিহ্নিত করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

## কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা দানের উপায়

১. **ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার (Personal Power and Rights):** কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মৌলিক অধিকার পূরণের সাথে সে কর্মস্থল ক্ষমতা ও অধিকার পেতে চায়। তাই এরূপ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদত্ত হলে কর্মী বা নির্বাহীগণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

২. **সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ (Fair Wrking Environment):** ফলপ্রদ কাজের পিছনে কর্ম-পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কর্মী যেখানে কাজ করে সেই স্থানের পরিবেশ যদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস সমৃদ্ধ ও হৈ চৈ মুক্ত হয় তবে তা কর্মীদের মনোবল উন্নত করে। এ ছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, কর্মীদের জন্য কেন্টিন, বিশ্রামাগার, প্রার্থানাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকসহ অধস্তনদের কাজে উদ্বদ্ধ ও অনপ্রাণিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ও উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. **নিরাপত্তা প্রদান (Security):** কর্মী কাজের ক্ষেত্রে যদি নিজেকে নিরাপদ মনে না করে তবে তার ওপর একটা মানসিক চাপ পড়ে। ফলশ্রুতিতে কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়। সেজন্য কাজের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করা দরকার। ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীদের বা অধস্তনদেরকে কাজে অনুপ্রাণিত করতে হলে চাকরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৪. **আকর্ষণীয় কাজ (Attractive Work):** কর্মীরা আনন্দদায়ক ও অবদানমূলক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসাহিত হয়। তাই কাজকে আনন্দপূর্ণ করা এবং কর্মী যে কাজ করছে তার গুরুত্ব তাদের নিকট তুলে ধরার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তদুপরি কর্মীদের প্রবণতা অনুসন্ধান এবং সে অনুযায়ী কাজ দেয়া উচিত।

৫. **উত্তম ব্যবহার (Fair Treatment):** ভালো ব্যবহারে যেমন অর্থ ব্যয় হয় না তদুপরি এর ফলাফলও অত্যন্ত বেশি। একজন নির্বাহী বা তত্ত্বাবধায়ক যদি তার কাজে দক্ষ হয়, অধস্তনদের সাথে সদয় ব্যবহার করে, তাদের সুখে-দুখের সাথী হয় এবং যোগ্য নির্বাহী হিসেবে তাদের মনোন্নয়নের চেষ্টা করে তবে সহজেই অধস্তনদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ সৃষ্টি করে কাজ আদয় করা সম্ভব।

৬. **ভালো কাজের প্রশংসা (Appreciation of Worthwhile Work):** মানুষ তার কৃতকর্মের প্রশংসা শুনলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্দীপ্ত হয়। তাই কর্মীদের অধিক কাজের জন্য যেমনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান ও তত্ত্বাবধান করতে হয় তেমনি ভালো কাজের জন্য প্রশংসা করা উচিত। প্রণোদনা কার্যকর করার অন্যতম উপায় হলো সৃজনশীল কাজের জন্য স্বীকৃতি প্রদান।

৭. **প্রশিক্ষণ সুবিধা (Training Facility):** উত্তম প্রশিক্ষণ, কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এটি কর্মীদের পদোন্নতি লাভে বা অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণে সক্ষম ও সাহসী করে তোলে। তাই উত্তম প্রশিক্ষণ সুবিধা কর্মীদের প্রণোদনা সৃষ্টির একটি অন্যতম উপায়। তাছাড়া পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশে সুযোগদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ধরণের প্রেষণা দানের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি কার্যকরী ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ।

৮. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Democratic Management):** ব্যবস্থাপনা যদি স্বেচ্ছাচারী না হয়ে কর্মীদের চিন্তা-ভাবনার প্রতি মূল্য দেয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত নেয় এবং অভাব-অভিযোগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তবে নির্বাহী তথা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। ফলে কার্যক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ বাড়ে।

৯. **সুবিচার প্রতিষ্ঠা (Establishing Equity):** প্রতিষ্ঠানের কার্য-সম্পাদনে কর্মীদের প্রতি অন্যায়-অবিচার স্বভাতই কর্মীদের ক্ষুব্ধ করে। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে ও সকল কার্যে যদি সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় এবং সকল কর্মীদের সাথে সমান আচরণ করা যায় তবে তা কর্মীদের প্রণোদিত করে।

১০. **সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান (Proper Supervision):** নির্বাহীগণ অধস্তন কর্মীদের তত্ত্বাবধান করে থাকে। আবার নির্বাহীগণও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপন কর্তৃক তত্ত্বাবধায়িত হন। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা এবং কাজের জবাবদিহিতা থাকতে হবে।

১১. **প্রবণতার ভিন্নতা (Variation in Aptitude):** কর্মীর ঝোঁক বা প্রবণতা বিচার করে সঠিক প্রেষণা দানের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

১২. **দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য:** কার্যকর প্রেষণা দানের পদ্ধতি নির্ধারণে কর্মীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হতে হয়।

১৩. **পুরস্কার (Rewards):** উত্তম কাজের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা যেতে পারে। এতে যারা পুরস্কৃত হয় তারা যেমনি উদ্দীপ্ত হয় তেমনি তাদের ন্যায় আমরাও এভাবে পুরস্কৃত হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করে।

১৪. **কেন্টিন সহযোগিতা (Canteen Facilities):** কার্যকালীন যে সকল প্রতিষ্ঠানে নাস্তা বা খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, সেক্ষেত্রে কেন্টিন সাবসিডি প্রদানের মাধ্যমেও কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান ও উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

## খ. আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একত্রে কার্য-সম্পাদন করতে হয়। কার্য-সম্পাদনের প্রক্রিয়া একে অপরের সাথে প্রশাসনিক একটি উর্ধ্বমূখী ও নিম্নমূখী সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানে অধীনস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐ প্রতিষ্ঠানের বা রাষ্ট্রের লক্ষ্য অর্জনে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা, বজায় রাখা ও উন্নয়নের সামর্থ্যই হল আন্তঃ ব্যক্তিক সম্পর্ক। আবার এই সম্পর্ক ছেদ করতে হলে

গঠনমূলকভাবে তা করার সক্ষমতা। নিজের যুক্তিসংগত মত প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায় ও অনাকাঙ্খিত চাপ প্রত্যাখ্যান করা, অন্যকে ভাল কাজ করার এবং মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে প্রভাবিত করার সামর্থ্যই হলো আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের দক্ষতা। কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থায় আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক ভূমিকা বর্ণনা করা হলোঃ

**১. আলোচনা করার দক্ষতা**

- প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য অর্জনে কার্য-প্রণালীতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্ত নিতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। এতে সহকর্মীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনায় কৌশলসমূহ জানতে হবে। তবে সমস্যা সমাধানে নিজেদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনা যায়। আবার সহকর্মীদের ইতিবাচক ভূমিকা পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ইতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়।
- প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়ম-নীতি অনুসরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্যে দিয়ে কার্য-সম্পাদন করতে হয়। এই সবের ব্যতীক্রম হলে প্রত্যাখান করার সামর্থ্য থাকতে হবে।

**২. দৃঢ় প্রত্যয়নমূলক দক্ষতা**

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে কোনো বিষয়ে নিজ মতামত প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মতামত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধীনস্তদের প্রতি আস্থা বা নিজের প্রতি আস্থা রাখর সক্ষমতা থাকতে হবে।

**৩. সহমর্মিতা**

একে অপরের অবস্থা ও চাহিদা বোঝা এবং বোঝার সামর্থ্য। কারোর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের ক্ষমতা থাকতে হবে।

**৪. সহযোগিতা ও দলগত কাজ**

- অপরের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া ও কর্ম-পদ্ধতিকে শ্রদ্ধা জানানো।
- নিজ নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্য যাচাই ও দলের কাজে সহযোগিতা করা।
- দলে সক্রিয় থাকা।

**৫. এ্যাডভোকেসি বা প্রভাবিত করার দক্ষতা**

- অপরকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য।
- অপরকে স্বমতে আনার সক্ষমতা।
- নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠা করার এবং উদ্বুদ্ধ করার সার্মথ্য।

তাছাড়া কর্মস্থলে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়নে কিছু দিকঃ

১. **অফিস বনাম বাড়িঃ** অফিসকে বাড়ির মতো মনে করা যাবেনা। কর্মস্থলে নিজস্ব পন্থা রয়েছে এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন প্রয়োজন। কখনো সহকর্মীর সাথে খারাপ আচরণ, তাহাদের সমালোচনা, নিন্দা করা যাবেনা এবং কখনো কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া যাবেনা। প্রয়োজনে বিষয়টি এড়িয়ে চলা, আবার অফিসের সহকর্মীগণ হবে বন্ধু, তবে বেশী বন্ধুত্ব ক্ষতিকর।

২. **হস্তক্ষেপঃ** সহকর্মীদের কাজে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবশ্যই সকল কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য বাস্তবায়নে এবং তাহাদের কাজের দায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। চাকুরীর দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

৩. **সুযোগঃ** প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। উপযুক্ত পরিবেশের জন্য স্থান করে দেওয়া আন্তঃ সম্পর্কের জন্য প্রয়োজনীয় এবং একজনের ব্যক্তিগত কথাবার্তা সম্পর্কে অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়া ভাল নয়। একজন কর্মচারী কোন চিঠিপত্র, ইনভেলপ, কুরিয়ার খুলা থেকে বিরত থাকা যাহা তাহার জন্য নয় এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়।

৪. **গুজবঃ** কর্মস্থলে ভিত্তিহীন গুজব চড়ানো যাবে না। যদি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অধস্তনদের কারোর কোন তথ্য চান তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে হবে এর উদ্দেশ্য কি এবং কোন সহকর্মীদের তথ্যের ব্যাপারে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কিনা? এক্ষেত্রে কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। এতে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক বজায় থাকে।

৫. **গোপনীয়তাঃ** আপনার সহকর্মীর সাথে সহকর্মীর কোন গোপনীয় বিষয় আলোচনা না করাই ভালো। যদি কেহ এ ধরণের গোপন বিষয় জানার জন্য অনুরোধ করলে সাড়া না দেওয়া বা এর অংশীদার না হওয়া। তাছাড়া কর্ম পরিবেশের গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রতি যত্নবান হতে হবে।

৬. **অহমিকাঃ** কর্মীদের অহমিকা ত্যাগ করতে হবে। কর্মীদের কাজের সময় ব্যক্তিগত উত্তেজনা পরিহার করতে হবে এবং কথা বলার আগে চিন্তা করতে হবে। সহকর্মীদের সাথে কৌতুক এর ন্যায় কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭. **দলগতঃ** কোনো কর্মীর সম্মুখে বা দলগত সদস্যকে তিরস্কার না করা। টিম লিডার কর্মীকে কনফারেন্স রুমে বা নির্বাহী নিজ কক্ষে কোনো কর্মীর ভুলত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। টিম লিডারদের মধ্যে তুলনা করবেন না। সকল কর্মীদের কাজ অনুযায়ী তাদের মূল্যায়ন এবং উপযুক্ত কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করা। কর্মস্থলে বাজে রাজনীতি পরিহার করা। কখনো কাহারো ক্ষতি করবেন না এবং কাহারো প্রতি ঈর্ষা পরায়ন না করা এবং কর্মস্থলে কর্মীদের মধ্যে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

## গ. যোগাযোগ

যোগাযোগ হলো দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে তথা বা সংবাদের আদান-প্রদান। সংবাদ বা তথ্যের এরূপ আদান-প্রদান কতকগুলো ধারাবাহিক পদক্ষেপের সমষ্টি। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন করা হয়। অর্থাৎ যোগাযোগ কতিপয় পদক্ষেপ বিশিষ্ট একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যোগাযোগ এ জড়িত উপাদান সমূহ হলো– যোগাযোগ কারী, সংবাদ, সংবাদ গ্রহীতা। যোগাযোগ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তথ্যের প্রেরক কর্তৃক তার মনের ভাবকে ভাষায় পরিণত করে সংবাদ আকারে তা প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রাহকের নিকট পৌছে দেয়া এবং গ্রাহক ও সে অনুযায়ী তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান তাই যোগাযোগ প্রক্রিয়া। যোগাযোগ কারী, সংবাদ এবং যোগাযোগ গ্রহীতা এ তিনটির সমন্বয়ে সর্বপ্রথম গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল যোগাযোগের একটি প্রাথমিক মডেল তৈরি করেন। মডেলটি নিম্নে দেওয়া হল–

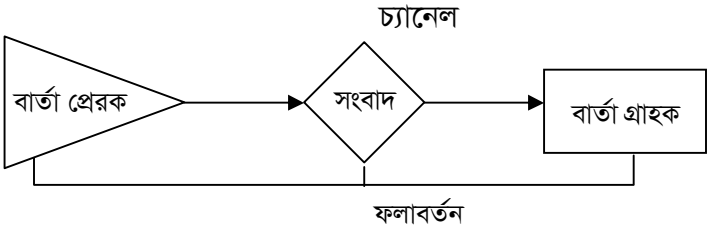


চিত্রঃ এরিষ্টোটল প্রদত্ত যোগাযোগের প্রাথমিক মডেল

এরিষ্টোটল প্রদত্ত তিনটি উপাদান ব্যতীত আরো কতগুলো উপাদানের কথা আধুনিক লেখকগণ উল্লেখ করেছেন। এসব উপাদানের সমন্বয়ে তারা একটি ব্যাপক ও বাস্তবসম্মত মডেল উদ্ভাবনের প্রয়াস পেয়েছেন। যোগাযোগের আধুনিক উপাদানগুলো নিম্নে আলোচিত হলোঃ

১. **তথ্যের উৎস (Source of Information):** প্রত্যেকটি যোগাযোগে তথ্যের একটি নির্দিষ্ট উৎস থাকে। উৎস কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা, পরিস্থিতি কিংবা ব্যক্তি হতে পারে। উৎস ব্যতীত যোগাযোগ সংঘটিত হতে পারে না।

২. **প্রেরক (Sender):** যে ব্যক্তি বা পক্ষ সংবাদ প্রেরণ করে তাকে যোগাযোগকারী বলা হয়। সংবাদ প্রেরক তথ্যের উৎস থেকে ধারণা আহরণ করে। মূলত তাকে ভিত্তি করেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত।

৩. **এনকোডিং (Encoding):** এনকোডিং হলো প্রেরকের মনের ভাব প্রেরণযোগ্য করে সাজানো। **হিমষ্ট্রিট ও ব্যাচি-** এর মতে, "Encoding is the putting fits of information into transmissible message". যে কোন যোগাযোগেই এনকোডিং অপরিহার্য। কারণ ধারণা সহজবোধ্য করার জন্য তা মনে মনে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে হয়।

৪. **সংবাদ (Message):** প্রেরক প্রাপকের নিকট যে ধারণা লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকাশ করে তাকে সংবাদ বলে। সংবাদ হলো যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মুখ্য বিষয়। সংবাদকে ঘিরেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সবকিছু আবর্তিত হয়।

৫. **চ্যানেল বা মাধ্যম (Channel):** যোগাযোগের তথ্য পরিবেশনের জন্য মাধ্যম আবশ্যক। সাধারণত টেলিফোন, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, চিঠি, টেলিগ্রাম, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, বই এগুলো সবই এক একটি চ্যানেল। যোগাযোগকারীকে সুবিধাজনক কোন এক বা একাধিক চ্যানেল বেছে নিতে হয় সংবাদ প্রেরণের জন্য।

৬. **প্রাপক/যোগাযোগগ্রহীতা (Receiver):** যোগাযোগকারী যে ব্যক্তি বা পক্ষের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে থাকে তাকে যোগাযোগ গ্রহীতা বা প্রাপক বলা হয়। প্রাপকের নিকট সংবাদ বা বার্তা পৌঁছানোর পরই প্রকৃত অর্থে যোগাযোগ প্রাথমিক পূর্ণতা লাভ করে।

৭. **ডিকোডিং (Decoding):** ডিকোডিং-এর অর্থ হলো প্রেরক কর্তৃক পরিবেশিত বার্তা বা সংবাদকে গ্রহণযোগ্য করে সাজানো। Wofford-এর ভাষায় "Decoding is the transformation of the received signal back into message using the appropriate systematic code." ডিকোডিং কার্য-প্রাপকের প্রত্যক্ষণ, উপলব্ধি জ্ঞান, মেধা, প্রথা বা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৮. **ফলাবর্তন (Feedback):** ফলাবর্তন যেকোন যোগাযোগ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যোগাযোগকারী যোগাযোগ গ্রহীতার নিকট হতে তার প্রেরিত তথ্যের যে প্রতুত্তর পায় তাকে ফলাবর্তন বলে। কার্যকর যোগাযোগের জন্য ফলাবর্তন অপরিহার্য। তাছাড়া যোগাযোগের আরও মৌখিক বা অমৌখিক, লিখিত, সক্রিয়ভাবে শোনা, অনুভূতি প্রকাশ ও আলাপ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

## ফলপ্রসু প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যোগাযোগ

ফলপ্রসু যোগাযোগ প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলপ্রসূ যোগাযোগের মাধ্যমে বার্তা প্রেরক, বার্তা গ্রাহক কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ তাদের মনের ভাব, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্খা, আদর্শ ইত্যাদি অপরপক্ষের নিকট পৌঁছে দিতে পারে। এরূপ উত্তম যোগাযোগের কতকগুলো অপরিহার্য গুণ থাকতে হয়। নিম্নে উত্তম যোগাযোগের গুণাবলি আলোচিত হলো:

১. **পূর্ব চিন্তা (Prior Thinking):** যোগাযোগের পূর্বেই উত্তমভাবে চিন্তা-ভাবনা করে মনের ভাবকে ভাষায় রূপান্তরিত করতে হয়। তাহলে বার্তাগ্রাহক সংবাদের অর্থ সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। এ কারণে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও সৃজনশীল চিন্তনকে যোগাযোগের অপরিহার্য গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. **সুপরিকল্পিত (Well-Planned):** ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে পরিকল্পনা। কাজেই যোগাযোগকারীকে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বেই এর বিষয়বস্তু, উপস্থাপন পদ্ধতি, স্থান, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহন করার প্রয়োজন পড়ে।

৩. **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (Particular Objectives):** একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যোগাযোগকারী যোগাযোগ স্থাপন করে। এই কারণেই যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যোগাযোগকারী স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক এবং এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই যোগাযোগ করা উচিত।

৪. **সময় বিবেচনা (Time Consideration):** তথ্য পরিবেশনে প্রেরককে সময় বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ যথাসময়ে বার্তা বা তথ্য প্রেরণ করা আবশ্যক। তা না হলে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে থাকে। এছাড়া স্বল্পসময়ে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হয়। তাই একটি উত্তম যোগাযোগ অবশ্যই যথাযোগ্য সময় বিবেচনায় এনে করার প্রয়োজন পড়ে।

৫. **যথার্থ মাধ্যম নির্বাচন (Selection of Proper Media):** যোগাযোগের বিষয়বস্তু বা তথ্য এর গ্রাহকের নিকট পরিবেশনের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। যোগাযোগকারীকে ভাব বা তথ্যের গুরুত্ব, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি মূল্যায়ন সাপেক্ষে কার্যকর মাধ্যম নির্বাচন করতে হয়। এরূপ যথার্থ মাধ্যম সহজ, দ্রুত ও ফলদায়ক যোগাযোগ নিশ্চিত করে।

৬. **সংক্ষিপ্ততা (Brevity):** আদর্শ যোগাযোগের একটি অপরিহার্য গুণ হলো সংক্ষিপ্ততা। যোগাযোগের বক্তব্য যত বেশি সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাসঙ্গিক ও সাবলীল হয়, যোগাযোগের কার্যকারিতাও তত বৃদ্ধি পায়। অহেতুক বেশি বক্তব্য বার্তা প্রাপকের মনে বিরক্তির সৃষ্টি করে।

৭. **নির্ভুলতা ও পূর্ণাঙ্গতা (Correctness and Completeness):** সংক্ষিপ্ততার খাতিরে যোগাযোগের বার্তা বা সংবাদ ভুল কিংবা অপূর্ণাঙ্গ হওয়া উচিত নয়। বার্তার বিষয়বস্তু হতে হবে নির্ভুল এবং পূর্ণাঙ্গ। অন্যথায় অপরপক্ষ সঠিক প্রতুত্তর দিতে ব্যর্থ হয় এতে যোগাযোগের উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

৮. **সম্পর্ক বিবেচনা (Relation Consideration):** বার্তা প্রেরক এবং বার্তা গ্রাহকের মধ্যেকার সম্পর্ক বিবেচনাপূর্বক যোগাযোগ করতে হয়। কারণ সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে সংবাদ বা বার্তার ধরণ নির্ধারিত হয়। তাই উত্তম যোগাযোগে অবশ্যই বার্তা প্রেরক এরূপ সম্পর্ক বিবেচনা করে থাকে।

৯. **পারস্পরিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠা (Maintaining Mutual Interest):** যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আদর্শ যোগাযোগের আরেকটি অপরিহার্য বিষয়। মোটকথা, যোগাযোগ এমনভাবে সুচিত হওয়া উচিত যাতে বার্তা প্রেরক ও বার্তা গ্রাহক উভয়েই তাদের স্বার্থ খুঁজে পায়।

১০. **অনুবর্তন ব্যবস্থা (Freedback System):** অনুবর্তন বা ফলাবর্তন ব্যবস্থা ব্যতীত যোগাযোগ অপূর্ণাঙ্গ এবং একপাক্ষিক হয়ে থাকে। এতে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায় না। তাই উত্তম যোগাযোগের মাধ্যমে লক্ষ্যার্জনে ফলাবর্তন ব্যবস্থার উপস্থিতি অপরিহার্য।

১১. **যোগাযোগের পর্যালোচনা ও ফল পরিমাপ (Reviewing and Measuring the Consequence of Communication):** প্রতিটি যোগাযোগের পরপরই এর সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা উচিত। এরূপ মূল্যায়ন করা হলে পরবর্তী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

১২. **পরামর্শ গ্রহণ (Taking Advice):** যোগাযোগ সম্পর্কীয় পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সাথে যদি কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট থাকে তবে সেক্ষেত্রে উক্ত পক্ষ বা পক্ষসমূহের সাথে পরামর্শ করা বাঞ্ছনীয়। এতে ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান বা দায়িত্ব এড়ানোর সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

১৩. **তথ্য উপস্থাপন (Presentation of Fact):** যোগাযোগকারীর তথ্য পরিবেশনার ধরণ ও আচার-ব্যবহার কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট ছাপ ফেলতে সক্ষম। সুতরাং যোগাযোগকারী যা বুঝতে চাচ্ছেন গ্রাহকও যেন ঠিক তাই বুঝেন- একটি ফলপ্রসূ যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেভাবেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

১৪. **কার্যকর শ্রবণ (Effective Listening):** যোগাযোগকারীকে একজন উত্তম শ্রোতা হতে হয়। যোগাযোগের সময় বার্তাগ্রাহকদের মনোভাব বোঝা এবং তাদের প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করার মতো ধৈর্য ও ক্ষমতা যোগাযোগকারীর থাকা আবশ্যক। তাহলেই যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে পারে।

১৫. **ভাষা নিয়ন্ত্রণ (Control Langauage):** ভাষা নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী যোগাযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। বার্তা ভাষার মাধ্যমে ভাব ও চিন্তা প্রকাশ করে। আবার বার্তা গ্রাহক ভাষার মাধ্যমেই তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যোগাযোগে ভাষা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৬. **বিষয়ভিত্তিক যোগাযোগ (Subjectwise Communication):** যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সময় এর বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখাও উত্তম যোগাযোগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় বক্তব্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলির সাহায্যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথভাবে তৈরি করা আবশ্যক।

১৭. **কথা ও কাজের মিল (Similarities in Word and Work):** যোগাযোগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতি স্বার্থক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর অভাবে যোগাযোগ দুর্বল হতে বাধ্য। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে বার্তাগ্রাহক স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতে দ্বিধাবোধ করে।

১৮. **অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কোন্নয়ন (Developent of Informal Relations):** বার্তা প্রেরকের আনুষ্ঠানিকতা পালন পূর্বক তথ্য পরিবেশনের পর এর সফলতা লাভের জন্য অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক উন্নয়নে নজর দিতে হয়। কারণ অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ বা সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক কার্য-সম্পাদনের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিতে অনেক সময়ই সহায়ক হয়।

১৯. **আমলাতান্ত্রিক বর্জন (Avoiding Bureauracy):** কার্যকর যোগাযোগের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক পরিহার করা অত্যাবশ্যক। আমলাতান্ত্রিক বা অতি আনুষ্ঠানিকতা যোগাযোগের স্বাভাবিক প্রবাহে অযথা বিলম্ব ও বাধার সৃষ্টি করে।

## উপসংহার

কোন প্রতিষ্ঠান বা অফিসের নির্বাহী বা প্রশাসকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবীর, আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদের সঠিক সম্মিলন ঘটিয়ে ও সুসমন্বয়ের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন করা। এসব কার্যক্রমের জন্য প্রশাসককে প্রতিটি স্তরে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় কর্মীদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিশেষে বলা যায়, প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর কার্যকরী করার জন্য একজন দক্ষ প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের কর্মীদের উদ্বদ্ধকরণে প্রেষণা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনে কার্যকরি দিক এবং সঠিকভাবে তথ্য ও আদান প্রদানে যোগাযোগ প্রক্রিয়া ফলপ্রসূর করতে অপরিহার্য গুণ জানা দরকার। এতে প্রেষণা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ কার্যকর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজের কৌশল বা হাতিয়ার।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

### ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. প্রেষণার উপাদানগুলো হলো–
   i. প্রয়োজন
   ii. আগ্রহ
   iii. তাড়না
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

২. প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্ব অধ্যাপক ভিক্টর ভ্রুম কত সালে প্রবর্তন করেন?
   ক. ১৯৬২ খ্রীঃ
   খ. ১৯৬৪ খ্রীঃ
   গ. ১৯৬৬ খ্রীঃ
   ঘ. ১৯৭১ খ্রীঃ

৩. আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক এর ক্ষেত্রে প্রভাবিত করার দক্ষতার বৈশিষ্ট্য-
   i. অপরকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য
   ii. দলে সক্রিয় রাখার সামর্থ্য
   iii. অপরকে স্বমতে আনার সক্ষমতা
   **নীচের কোনটি সঠিক?**
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. যোগাযোগের প্রাথমিক মডেলটি কোন দার্শনিক প্রবর্তন করেন?
   ক. সক্রেটিস
   খ. প্লেটো
   গ. ফ্রেডারিক হার্বাট
   ঘ. এরিস্টোটল

**উত্তরমালা:** ১. গ, ২. খ, ৩. ক. ৪. ঘ

## খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. কর্মী প্রেষণা বলতে কী বোঝায়?
২. মাসলোর চাহিদা সোপান তত্ত্ব কী?
৩. প্রেষণার প্রত্যাশা তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
৪. আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়নে পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করুন?
৫. প্রেষণা দানের আর্থিক ও অনার্থিক বিভিন্ন উপায়সমূহ চিহ্নিত করুন।
৬. যোগাযোগ বলতে কী বোঝায়?
৭. যোগাযোগের উপাদানগুলো লিখুন।
৮. যোগাযোগ প্রক্রিয়া কীভাবে তথ্য প্রেরণ করা হয়?
৯. যোগাযোগের প্রাথমিক মডেলটি বর্ণনা করুন?

## গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রেষণা চাহিদা অনুধাবনের চারটি তত্ত্ব উল্লেখ পূর্বক প্রত্যেকটির বর্ণনা কর।
২. প্রেষণা চাহিদা তত্ত্বের আলোকে প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করে- ব্যাখ্যা করুন।
৩. আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক কীভাবে প্রশাসন ব্যবস্থাপনা কার্যকর করে তোলে- স্বপক্ষে আপনার মতামত দিন।
৪. যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রশাসন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কতটুকু প্রতিফলন ঘটায় সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
৫. ফলপ্রসূ প্রশাসনে যোগাযোগের অপরিহার্য গুণাবলী কতটুকু ভুমিকা রাখে তা ব্যাখ্যা করুন।

# পাঠ ২.২: প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদনের ভূমিকা
# Role Expectation and Role Performance

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রত্যাশা তাৎপর্য তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- কার্য-সম্পাদন প্রেষণার উপর নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করতে পারেন।
- প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদনের করণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারেন।

## ভূমিকা

কোন প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে কর্মীর বা নির্বাহী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। প্রতিষ্ঠানের উধ্বর্তন কর্মীদের চাহিদা এবং অধস্তনদের চাহিদার মধ্যে ভিন্নতা থাকে। আবার উর্ধ্বতন নির্বাহী বা প্রশাসকের মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি ইত্যাদি পেতে চায় আবার অধস্তনরা আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা পেতে আগ্রহী। তাই প্রতিষ্ঠান বা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের বা কর্মচারীদের কাজের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কর্মীর কাছ থেকে কী কী প্রত্যাশা আশা করা যায় এবং এই প্রত্যাশাগুলো অর্জনে কর্মীদের কাজের কার্য-সম্পাদনে কতটুকু সফল বা বিফলতা তা প্রশাসক (উর্ধ্বমূখী, সমান্তরাল ও নিম্নমূখী) মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্যাশার সাথে কার্য-সম্পাদন আবার কার্য-সম্পাদনের সাথে প্রণোদনা সম্পর্ক অর্থাৎ প্রত্যাশা পূরণের পেছনের প্রণোধনার সম্পর্ক বিদ্যমান।

তাই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে একজন ব্যক্তি বা কর্মীর দুটি সত্ত্বা কাজ করে। একটি হলো তার ব্যক্তি সত্ত্বা এবং অপরটি হলো দলীয় সত্ত্বা। কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রধান ব্যক্তির এই উভয় সত্ত্বার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হয়। কাজেই একদিকে যেমন ব্যক্তির চাহিদা পূরণ হয়, তেমনি দলের চাহিদাও পূরণ হয়। সাথে সাথে প্রত্যাশা অর্জনে কার্য সম্পাদন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় যা এই দুটির সত্ত্বা সুষ্ঠু সমন্নয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করে।

## প্রত্যাশা তাৎপর্য ও ভুমিকা

সংগঠন ব্যবস্থাপনায় দু'টি দিক রয়েছে। একটি হলো প্রতিষ্ঠানিক পরিমন্ডল, অপরটি হলো ব্যক্তিগত পরিমন্ডল। প্রতিষ্ঠানিক পরিমন্ডলে রয়েছে প্রতিষ্ঠান, ভূমিকা এবং প্রত্যাশা। ভূমিকা দ্বারা ভূমিকার অধিকারী ব্যক্তির আচরণকে বুঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তি যে ভূমিকা বা পদে রয়েছে, সে পদ বা ভূমিকা সংশ্লিষ্ট আচরণের মধ্যে দিয়ে ভূমিকার রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি ভূমিকার সঙ্গে দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা থাকে। এগুলোকে বলা হয় প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশাগুলোকে দ্বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যাশা এবং ব্যক্তিগত প্রত্যাশা হিসাবে অভিহিত করা হয়। আবার ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে রয়েছে ব্যক্তি নিজে, তার ব্যক্তিগত চাহিদা এবং তার ব্যক্তিত্ত্ব। গেটজেলস্ এর মতে ব্যক্তির চাহিদা পূরণের নিজস্ব ধরণ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রতি তার প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। প্রাতিষ্ঠানিক পরিমন্ডল এবং ব্যক্তিগত পরিমন্ডল সহযোগে প্রতিষ্ঠানের একটি সামাজিক ধারা গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানের এসব প্রত্যাশাগুলোর মধ্যে কিছু বিধিবদ্ধ বা আইনগত দিক রয়েছে আবার কিছু প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রশাসকের সিদ্ধান্ত

দ্বারা গৃহীত হয়। গৃহীত প্রত্যাশাসমূহ সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদনে কর্মীবৃন্দ বা ব্যক্তিবর্গ তাদের ব্যক্তিত্ব, চাহিদা, প্রত্যাশা এবং ভূমিকার পরিস্ফুটনে প্রশাসককে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হয়। তাই অভিজ্ঞ প্রশাসক নিজে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সুকৌশল নির্দেশনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অফিসের সকল সদস্য তথা কর্মীবৃন্দের মাঝে প্রণোদনা ও কর্মস্পৃহা জাগ্রত করেন এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

তবে ইয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিক্টর এইচ. ভ্রুম তার প্রত্যাশা তত্ত্বে অনুযায়ী কর্মী কোন লক্ষ্য অর্জনের প্রত্যাশায় কাজ করে এবং প্রণোদিত হয় তা চিহ্নিত করতে হবে। যখন কর্মীর নিকট উদ্দেশ্য যত বেশি মূল্যবান হবে সে তত বেশী উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কার্যে মনোনিবেশ করবে। তার তত্ত্বে প্রেষণা তিনটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন–

প্রেষণা = প্রত্যাশা × সহায়তা × যোগ্যতা অর্থাৎ কর্মীর কাজের প্রত্যাশা নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তার অনুভুতি শক্তির উপর। তার প্রত্যাশা তত্ত্বটি তিনটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি ধারণা হলো-

১. **আকর্ষণীয়তা (Attractiveness):** কাজের উপর ব্যক্তি যে সম্ভাব্য ফলাফল বা পুরস্কার অর্জন করতে পারে তার গুরুত্ব হচ্ছে আকর্ষণীয়তা। এটি ব্যক্তির আবেগের ইতিবাচক মানসিক অবস্থা যা প্রত্যাশা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

২. **কার্য-সম্পাদন ও পুরস্কারের যোগসূত্র (Performance and Linkages):** নির্দিষ্ট পর্যায়ের কার্য-সম্পাদন প্রত্যেক কার্যফল অর্জনের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে ব্যক্তির মধ্যে এরূপ বিশ্বাস বা অনুভূতির মাত্রা হচ্ছে কার্য-সম্পাদন ও পুরুস্কারের সম্পর্ক। ব্যক্তির কার্য আচরণ দ্বারা নির্দিষ্ট কার্য-সম্পাদন বা প্রত্যাশিত কার্যফল অর্জন তার বিশ্বাস বা আস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে।

৩. **প্রচেষ্টা ও কার্য-সম্পাদন যোগসূত্র (Effect Performance Linkage):** ব্যক্তির প্রচেষ্টা প্রয়োগের শক্তি তাকে কার্য-সম্পাদনে প্ররোচিত করে। এরূপ অনুভূতির সম্ভাবনা হচ্ছে প্রচেষ্টা ও কার্য-সম্পাদনের সংযুক্তি। ব্যক্তির অনুভূতি ও প্রত্যাশার সমন্বয়ে ইচ্ছাশক্তির সৃষ্টি হয়। নিম্নে প্রত্যাশা অর্জনের প্রবাহটি দেখানো হলো:

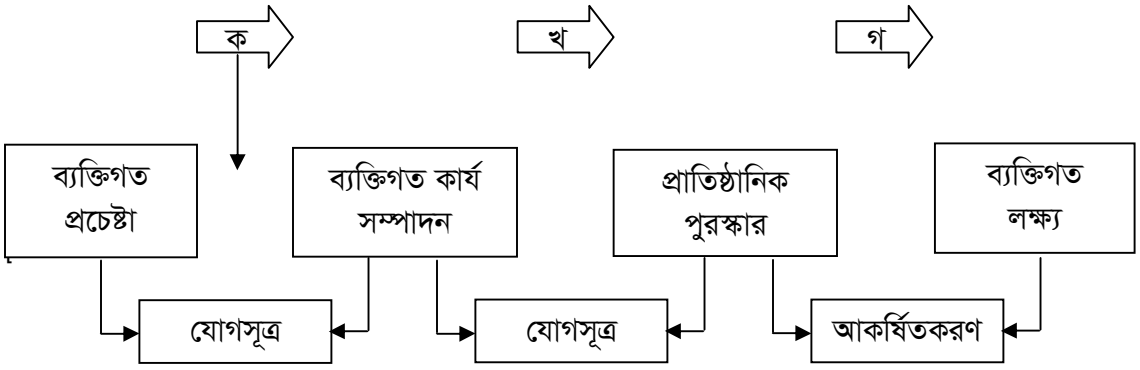


উপরোক্ত প্রত্যাশা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বলা যায় কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্বসমূহ হলো প্রত্যাশা এবং এই প্রত্যাশা অর্জনে কর্ম-সম্পাদন উপর নির্ভরশীল। আবার কর্ম-সম্পাদন করতে প্রণোদনার প্রয়োজন হয়। তাই একজন প্রশাসককে প্রত্যাশিত ফল পেতে হলে নিচের বিষয়গুলো দৃষ্টি দিতে হবে।

- কোন কর্মী কী ধরণের ফলাফল প্রত্যাশা করে তা বুঝতে হবে। ফলাফল ইতিবাচক প্রশাসকের যেসব দিক দৃষ্টি দিতে হবে তাহলো: নিরাপত্তা, বিশ্বস্ততা, সহকর্মী- সহকর্মী উত্তম সম্পর্ক, দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ এবং উপযুক্ত কাজের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।
- কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক কিনা তা কর্মীর মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব ও চাহিদার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফল কারো কাছে আকর্ষণীয় ও ইতিবাচক মূল্যায়িত হলে সে তা অর্জনে সচেষ্ট হবেন।
- কর্মীর কার্য সম্পাদন মূল্যায়নের জন্য করণীয় বিষয় এবং কার্য-সম্পাদনে বিচারের নিয়ামক কর্মীকে অবহিত করতে হবে।
- কর্মীর সফলতা নির্ধারণে চলকের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কর্মীর নিজস্ব পারদর্শিতা ও তাদের সামর্থ্য কতটুকু এবং তার সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা কীরূপ তা বিবেচনা করতে হবে।

## কার্য-সম্পাদন

একজন প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের যথাযথ নির্দেশ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত হয়ে কার্য সম্পাদন করে থাকে। এখানে প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকের নির্দেশ যখন কর্মীবৃন্দের মধ্যে প্রভাবকের কাজ করে তখনই তাদের মাঝে প্রণোদনা সৃষ্টি ও কর্মস্পৃহা জাগ্রত হয়। ফলে যথাযথ নির্দেশ প্রদানে গুণগত বৈশিষ্ট্যের অনেকটা কর্মীবৃন্দের কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধি করে। আবার কর্মীর সামর্থ্য এর উপর নির্ভর করে কার্য সম্পাদন। কর্মীর সামর্থ্য হলো কর্মীর কার্য শক্তি বা কার্য ক্ষমতা। কর্মীর কার্যফলকে সম্পাদিত কার্য বা কার্য সম্পাদন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক ও অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রত্যেক কর্মীর সামর্থ্য, প্রেষনা ও সম্পাদিত কার্য-প্রকৃতি বিষয়গুলো পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। কর্মীর সামর্থ্যের সাথে কাজ করার প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে। আর কর্মীকে কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে উপযুক্ত প্রেষণার প্রয়োজন। কর্মীকে প্রয়োজনীয় প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে কাজে উদ্বুদ্ধ করে তার সামর্থ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার করা যায়। এতে অধিক কার্য সম্পাদনের নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হয়। ফলে কর্মীর দ্বারা সম্পাদিত কার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। একটি প্রতিষ্ঠানের অধিক কার্য-সম্পাদন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে কর্মীর দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে কর্মীর দক্ষতা ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। যথাযথ প্রেষণার মাধ্যমেই কর্মীদের মাঝে কাজের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ও তাদের সামর্থ্যের কাম্য ব্যবহার সম্ভব হয়। যার ফলে কর্মীদের কাজের পরিমাণ অধিক হয় এবং কার্য সম্পাদন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়।

আবার কার্য-সম্পাদন কর্মীর ক্ষমতা, জ্ঞান এবং প্রেষণার উপর নির্ভর করে চ = গ (অ+ক) এখানে প্রেষণা (গ) স্থির থাকলেও সামর্থ্য ও জ্ঞান (অ+ক) বৃদ্ধি পেলে মোট কার্য-সম্পাদন (চ) বৃদ্ধি পাবে। আবার সামর্থ্য ও জ্ঞান (অ+ক) স্থির থাকলে ও শুধু প্রেষণা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কার্যফল বা কর্ম সম্পাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। সুতরাং প্রেষণা কর্মীর কার্য-সম্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আবার প্রেষণার ফলে কর্মীর কার্য ক্ষমতা ও কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কার্য দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে কার্য-সম্পাদনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ফলপ্রসূ প্রশাসন ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা বা দায়িত্বসমূহের কর্মীর কার্য-সম্পাদনে প্রেষণার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কর্মীর দায়িত্ববোধ থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতির অনুসরণ ও ব্যক্তির সামর্থ্য ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কার্য-সম্পাদন করে থাকে। তবে ব্যক্তির কাজগুলো যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিবেচনা করে যদি কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে কার্যকর ব্যবস্থাপনায় কার্য-সম্পাদন এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এই ক্ষেত্রে প্রশাসক বা ব্যবস্থাককে নিম্নের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

- কর্মীর উপর দায়িত্বগুলো বা কাজের বিভিন্ন দিকগুলো নিস্পন্ন করার জন্য কতটুকু সময়ের প্রয়োজন তা পরিমাপ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানে স্ব স্ব কর্মীর কার্য সম্পাদনের জন্য প্রমিত সময়সীমা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের কর্মীর দক্ষতা, জ্ঞান, সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে বিবেচনায় এনে কাজের দায়িত্ব বন্টন করতে হবে। অর্থাৎ যে কাজটি করতে সক্ষম হবে সেটিই দিতে হবে।
- প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মীর দায়িত্ব হবে শুধু কাজের সুষ্ঠু সম্পাদন করা।
- প্রশাসক বা ব্যবস্থাপক কার্য-সম্পাদনে পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করে দেবে আর কর্মীগণ তা অনুসরণ করবে।
- কর্মী উন্নয়ন এবং কার্য-সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা
- প্রশাসককে কোন প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে প্রেষণার গুরুত্ব তা অনুধাবন করা এবং কর্মীদের কার্য-দক্ষতা ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- কর্ম-সম্পাদনে প্রশাসককে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- কর্মীদের ভিতর আত্ম-উন্নয়নের সবরকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

## প্রত্যাশা এবং কার্য-সম্পাদন

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কর্মীদের কাজের দায়িত্বগুলো চিহ্নিত করা এবং যে যে কাজের জন্য অধিকতর উপযুক্ত তাকে সে কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। তাহলে এইসব প্রত্যাশা অর্জনে কার্য-সম্পাদন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। এর পাশাপাশি প্রতিটি কর্মীর জন্য কর্ম তালিকা তৈরি করে তাদেরকে অবহিত করতে হবে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য-সম্পাদনের হল কিনা তা বিচার বা মূল্যায়ন করতে হবে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের একটি প্রত্যাশা ও কর্ম-সম্পাদনের করণীয় বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো:

১. **কাজ উৎপাদন বা কাজের ধরণ (Work Product):** কর্মী কর্তৃক কাজের গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় দিক করণীয় ক্ষেত্রে প্রত্যাশাসমূহ হতে পারে। যেমন– চিঠিপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করা, কাজের শৃঙ্খলার পেশাগত কাজ, সময়সূচী মোতাবেক আগমন ও প্রস্থান, নির্ধারিত কাজ সঠিক সময় সম্পন্ন, ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য-সম্পাদন, তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ, নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ, দৈনন্দিন কর্মতালিকা সন্তোষজনক ভাবে সম্পন্ন করা ইত্যাদি।

২. **নির্ভরতা (Dependability):** নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কাজ করা, সময়ের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কাজ করা, সভায় যথাসময়ে উপস্থিতি, নিরাপত্তার প্রক্রিয়া, পোষাক বা ইউনিফর্ম, ছুটি, কার্য সম্পাদনে অতিরিক্ত সময় ব্যয়, বিরতির সময় ইত্যাদি।

৩. **সহযোগিতা (Coperativeness):** সহকর্মী বা জনগণের সাথে কাজ করার জন্য পরিবেশ বা নতুন পরিবেশ সৃষ্টিমূলক কাজ যেমন আন্তঃবিভাগের সাথে কাজ করা, কোন অভিযোগ ব্যতীত কার্য সম্পাদন, দলগত কাজ, একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া, সাহায্য করা, মতানৈক্য দূর করা, কাজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস, সম্মানবোধ জাগ্রত ইত্যাদি।

৪. **অভিযোজ্যতা (Adaptability):** কাজের পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করতে হয় যেমন- স্থানীয় ব্যক্তিকর্তাদের সাথে যোগাযোগ, কর্ম-বন্টন পরিবর্তন, হঠাৎ কোন কাজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, কাজের নির্দেশনা পরিবর্তন, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার টাইপ মেশিন এর পরিবর্তে কম্পিউটার লিটারেসী ইত্যাদি।

৫. **যোগাযোগ (Communication):** তথ্য দেওয়া ও গ্রহণ করা যেমন মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে, লিখিত ও মৌখিক উভয় ক্ষেত্রে সুস্পষ্টতা, ফোন, ই-মেইল, ওয়েবসাইট যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি।

৬. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Makes):** প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত বা সমস্যা সমাধান চিন্তা করা যেমন- প্রতিদিনের সমস্যা সমাধান স্বাধীনভাবে করা, সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা, নতুন সম্ভাবনা দিক বিবেচনা, ন্যায় সম্মত বিচার, সিডিউল বা পুনরায় সিডিউল (কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে), ভয়ভীতি, সহযোগিতা শূন্য কোটায় (Zero Toleerance) ইত্যাদি।

৭. **সেবাদান (Service to Client/Public):** জনগণের সাথে যুক্ত কার্য-সম্পাদনে তাদের চাহিদা পূরণে নিশ্চিত করা। সে ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা, নিরপেক্ষতা, সততা বজায় রেখে জনগণের কল্যাণার্থে সুচারুরূপে কার্য-সম্পাদন করা।

৮. **অফিস সরঞ্জাম ব্যবহার:** অল্প ব্যয়ে কার্যকর ভাবে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় এবং সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যেমন- কম্পিউটার ব্যবহারে বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করা।

৯. **দলগত কাজ (Work Group Management):** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাযৃকর ভাবে দলীয় কাজ সম্পন্ন করে যেমন দলে সক্রিয় অংশগ্রহণ, মতামত দেওয়া, সহকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, পেশাগত উন্নয়ন পরামর্শ বা সহযোগিতা দেওয়া ইত্যাদি।

১০. **কার্য-সম্পাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিচার করা:** প্রতিষ্ঠানের একজন প্রশাসক তার অধস্তনদের কার্য-সম্পাদনে কর্ম-বিভাজন অনুসারে কাজের মানদন্ড বিচার করা। সেই ক্ষেত্রে প্রতিদিনের কাজ মান নির্ধারণে পর্যবেক্ষণ অনুসূচী ব্যবহার করা। এতে প্রত্যেক কর্মীগণের প্রত্যাশা অনুসারে কার্য-সম্পাদনের সফলতা নির্ণয় করে উপযুক্ত করে উপযুক্ত কাজের জন্য কর্মী নির্বাচন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে কার্য-সম্পাদনে প্রশাসক, ব্যবস্থাপক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রত্যেক এর স্ব স্ব নির্ধারিত ও অনির্ধারিত দায়িত্ব যদি জানা থাকে তবে প্রশাসন ব্যবস্থাপনা কার্যকর ভুমিকা রাখবে নিসন্দেহে।

## উপসংহার

যে কোন প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক তার অধস্তনদের কাজ বা দায়িত্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে এবং বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। প্রত্যাশা কতটুকু কার্যকরভাবে অর্জিত হবে তা প্রেষণার উপর নির্ভর করে। আবার প্রত্যাশা অর্জনে সুষ্ঠুভাবে কার্য-সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। অতএব প্রেষণা, প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদনের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই প্রশাসক চলমান ব্যবস্থাপনায় যথাযথ প্রত্যাশা নির্বাচন বা দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করে প্রাসঙ্গিক নির্দেশনার মাধ্যমে কার্য-সম্পাদনের ভূমিকা পালনকে সক্রিয় থাকতে হয়। পরিশেষে বলা যায় ফলপ্রসূ প্রশাসন ব্যবস্থাপনা করে তুলতে প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

### ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. প্রাতিষ্ঠানিক পরিমন্ডলে রয়েছে-
   i. প্রতিষ্ঠান
   ii. ভূমিকা
   iii. প্রত্যাশা
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

২. প্রত্যাশা তত্ত্বটি উদ্ভাবক কে?
   ক. ফ্রেজারিক হার্জবার্গ
   খ. ডগলাস ম্যাকগ্রেগর
   গ. আব্রাহাম এইচ মাসলো
   ঘ. ভিক্টর এইচ ভ্রুম

৩. কর্মীর যথাযথ কার্য-সম্পাদন ও প্রত্যাশা পূরণের ধারণাসমূহ-
   i. আকর্ষণীয়তা
   ii. প্রচেষ্টা ও কার্য-সম্পাদন যোগসূত্রে
   iii. পুরস্কার ও প্রচেষ্টা
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. উত্তম কার্য-সম্পাদন নিচের কোনটির উপর নির্ভরশীল?
   ক. নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   খ. নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ
   গ. পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত্র গ্রহণ
   ঘ. নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

**উত্তরমালা:** ১. খ, ২. গ, ৩. ক, ৪. গ

## খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. প্রত্যাশা বলতে কী বোঝায়?
২. প্রত্যাশা তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
৩. প্রত্যাশা ও প্রেষণার সূত্রটি কী?
৪. প্রত্যাশার ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে নজর দিতে হবে সেগুলো চিহ্নিত করুন।
৫. কার্য-সম্পাদন বলতে কী বোঝায়?
৬. কার্য-সম্পাদন প্রেষণার উপর নির্ভরশীল সম্পর্কিত সূত্রটি বর্ণনা করুন।
৭. কার্য-সম্পাদন দক্ষতা অর্জনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বণর্না করুন।

## গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রত্যাশা তত্ত্ব অনুসারে কার্যকর প্রশাসনে প্রত্যাশার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
২. প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদন পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করে সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।
৩. প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদন ফলপ্রসূ প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করুন।
৪. কার্যকর কার্য-সম্পাদনে কর্মীর উপর প্রেষণা প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৫. প্রত্যাশা ও কার্য-সম্পাদনে করণীয় বিষয় সমূহ উল্লেখপূর্বক আপনার প্রতিষ্ঠানের কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখবে সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

# পাঠ ২.৩: শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্বশাসন এবং জবাবদিহিতা Autonony and Accountibility in Education Administration and Management

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্বায়ত্বশাসন কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জবাবদিহিতা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জবাবদিহিতার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- জবাবদিহিতার কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।

## ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে সমন্বিত এবং সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উপর। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হচ্ছে শিক্ষা কর্মকান্ডের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মানবীয় উপাদান এবং বস্তুগত সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া, আর এ সম্পর্কিত নীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হলো প্রশাসন। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দুই ধরণের সরকারি ও বে-সরকারী পর্যায় রয়েছে। আবার সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিয়ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা ও শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ভূমিকা রেখে চলছে। এ অবস্থায় প্রতিটি অর্থাৎ সরকারি ও বে-সরকাররি পর্যায়ে স্ব স্ব-প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## স্বায়ত্বশাসন (Autonomy)

Autonomy শব্দটি আভিধানিক অর্থ এসেছে Auto → Self এবং Nomos → Law অর্থাৎ নিজস্ব আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। তবে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এবং সরকারী অনুমোদনক্রমে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বলা হয়। যেমন- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ইত্যাদি। আবার সরকারের আর্থিক ও প্রশাসক ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আয় নিজস্ব নিয়মনীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোক যথাক্রমে স্বায়ত্বশাসিত বা আধা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। শিক্ষা ব্যবস্থায় দুই ধরণের প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। একটি হলো সরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান এবং অপরটি হলো সরকারের অনুমোদনক্রমে বে-সরকারী ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। তবে বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বৈত নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের কতিপয় বিষয় দেখাশুনা করে এবং বাদ বাকী বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব জনগণের। ফলে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় এবং দায়িত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ও সরকারি সহায়তার সমন্বয়ে

প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনায় ম্যানেজিং কমিটি ও গভনিং বডি শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। তাছাড়া শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার শীর্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হয়।

তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে থাকেন প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ। তদুপরি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হওয়া সত্ত্বেও তিনি একাই অথবা নিজ কর্তত্বে কাজ করেন না। বিভিন্ন আইন-কানুন বিধি, প্রশাসনিক আদেশ, নির্দেশাবলি ইত্যাদির আওতায় তাকে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতে হয়। এসব কিছুর উৎস হল সরকার, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। এসব সংস্থার মূল ভূমিকা হলো মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ডসমূহ শ্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে যথাক্রমে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান, শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান পরিচালনা ও উন্নয়ন করা।

## শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ভূমিকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। যুগ ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক চেতনা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে এর পরিবর্তন, পরিমার্জন ও নবায়ন অপরিহার্য। এ প্রেক্ষিতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করণের মাধ্যমে সমকালীনতা প্রদানের লক্ষ্যে এনসিটিবি ধারাবাহিকভাবে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, নবায়ন ও উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং নিজেই এর নির্বাহী সংস্থা। এসব প্রতিষ্ঠান সমূহ স্ব স্ব এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠান অনুমতি ও স্বীকৃতি প্রদান, পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দূর্বলতা শনাক্তকরণ ও প্রতিকার, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ ও সনদ প্রদানে প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মতামত প্রদানের অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপরোক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠানের মূল বিন্দুতে কাজ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে অধ্যক্ষ /প্রধান শিক্ষক। প্রশাসক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং আইনকানুন অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া সরকার কর্তৃক যাবতীয় নির্দেশনা, এনসিটিবি কর্তৃক শিক্ষাক্রম যথাযথ বাস্তবায়ন, শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা ও সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত ব্যবস্থাপনার অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণ ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা করা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

## জবাবদিহিতা (Accountability)

শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে যথাযথ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ওপর। সমন্বিত ও সুসংগঠিত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যতীত শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমানে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রত্যয় হচ্ছে জবাবদিহিতা। প্রশাসনিক গতিশীলতা এবং দায়িত্ব সচেতনতাই এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যা জনকল্যাণে নিবেদিত। জবাবদিহিতার সাথে স্বচ্ছতা ওতোপতোভাবে জড়িত। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা হল অবিচ্ছেদ্য মূল্যবোধ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ সূচক। শিক্ষা প্রশাসন বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পন্নকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রীতিতে সততা,

ন্যায়পরয়ণতা ও বিচক্ষণতা নির্ভর কাঙ্খিত আদর্শের উন্মুক্ত প্রতিফলনকৃত যথার্থ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমই স্বচ্ছতা। এটি জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ দিক। তাই যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক কর্মকতা ও কর্মচারীদের সকল কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এতে করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীর নির্ধারিত কাজের মাঝে স্বচ্ছতা থাকার সম্ভাবনা বেশী। স্বচ্ছতার অনুশীলন এবং জবাবদিহিতার প্রত্যয় নিজের মাঝে থাকলে যে কোন প্রশাসনিক স্তরে অবস্থানকারীর যে কোন ব্যক্তির মাঝে সংশ্লিষ্ট কাজের অর্থনৈতিক, অনিয়মতান্ত্রিকতা বা দুর্নীতি করার সুযোগ থাকে না। এতে প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে নতুনত্বের প্রগতিশীলতার নিজেকে টিকে রাখতে হলে অবশ্যই নতুন কর্মউদ্দীপনায় যথার্থ উপায়ে প্রশাসনিক কার্যাবলি সুসম্পন্ন করতে হবে। সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্যের কার্যাবলি সঠিক জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে। সাধারণত জবাবদিহিতা বলতে কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলির সচিত্র প্রতিফলিত করার বাধ্যতামূলককেই বোঝায়। জবাবদিহিতার ইংরেজী শব্দ হল Accountability. এটি Account, Accountable-এর ক্রমবিবর্তন রূপ। এখানে Account $\rightarrow$ Accountable $\rightarrow$ Accountability এসেছে যাদের অর্থ হল জবাব $\rightarrow$ জবাবদিহিতা। কাজেই জবাবদিহিতা বলতে যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পন্ন শেষে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট তার পরিপূর্ণ জবাব দাখিল প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ শিক্ষা প্রশাসনিক স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও রীতি নীতি কার্যাবলি সম্পাদন শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উক্ত কার্যাবলির সঠিকভাবে সম্পাদন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য পরিপূর্ণভাবে জবাবদানের যথার্থ প্রক্রিয়া হল জবাবদিহিতা। সঠিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ প্রত্যয়। জাতীয় প্রত্যাশায় বর্তমানে শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক যাতে করে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত ও কাঙ্খিত জাতি গঠিত হতে পারে। যে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পাদিত দায়িত্ব কর্তব্যের সার্বিক জবাবদিহিতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও উন্নয়ন সাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। এ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সাধনে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। জাতীয় উন্নয়নে চেতনাকে এটি বেশ প্রভাবিত করে থাকে। কাজেই এর জন্য জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাস, সেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ, স্বজনপ্রীতি হ্রাস, সততা ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠিত হয়, নীতিবোধ ও মূল্যবোধ সক্রিয় ও দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকের পরিচিতি জন্মে।

## প্রশাসনে জবাবদিহিতার উদ্দেশ্য (Objectives of Administrative Accountability)

শিক্ষা প্রশাসন ও অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার উদ্দেশ্য বহুমূখী। এর দ্বারা প্রশাসনিক কার্য-স্বচ্ছতা বজায় থাকে। নিচে শিক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতার মূখ্য উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করা হলো-

- জবাবদিহিতার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে প্রণীত শিক্ষার উদ্দেশ্য হাসিল করা;
- সময় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়;
- প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং অনৈতিকতা রোধ করা যায়;
- যথাসময়ে কার্য-সম্পাদনের তাগিদ থাকে;
- জনপ্রতিনিধিদের মাঝে কর্মদক্ষতা ও প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়;
- প্রশাসনিক নির্বাহীদের একঘেয়েমি এবং খামখেয়ালিপনা রোধ করা যায়;
- কার্যদক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা;
- শিক্ষা প্রশাসনে সকল স্তরে স্বচ্ছতা আনা যায়;
- উর্ধ্বতন এবং অধঃস্তনের মাঝে কার্য সম্পর্ক তৈরি করা;

- জাতীয়ভাবে শিক্ষার উন্নয়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব;
- নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয়া যায়;
- উদ্দেশ্য এবং কার্য-বাস্তবায়নের সমন্বয় যাচাই করা সম্ভব;
- আয় ব্যয় স্বচ্ছতা প্রদর্শিত হয়;
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

## জবাবদিহিতার কৌশল (Strategies of Accountability)

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় বিধায় এর অনুসরণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর অনুশীলন অনেক বেশি তাৎপর্যময়। জবাবদিহিতার কৌশল হিসেবে নিচের দিকগুলো উল্লেখ করা যায়। যেমন-

- শিক্ষা প্রশাসনের কমকর্তা-কর্মচারীর দৈনন্দিন কার্য বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান।
- প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি অন্তর সরেজমিনে কার্য-পরিসর পরিদর্শন করা।
- কার্য পরিসরে কর্মকর্তা, কর্মচারীর অদক্ষতা প্রমাণিত হলে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া।
- প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ দিয়ে জবাবদিহিতার গুরুত্ব বুঝানো।
- আর্থিক জবাবদিহিতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে অডিট করা।
- জবাবদিহিতা সুনিশ্চিতকরণের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পরিসর চিহ্নিত করা।
- জবাবদিহিতার মাধ্যমে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কর্মতৎপর ব্যক্তির যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রণোদনার ব্যাখ্যা করা।
- সময়ের কাজ সময়ে সম্পাদনের জন্য প্রেরণা জাগ্রত করা।

আধুনিক শিক্ষাবিদগণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতার কৌশলকে একটি চক্রের মাঝে বর্ণনা করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের শিক্ষা-প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় কতিপয় কার্য ধাপ অনুসরণ করে জবাবদিহিতাকে সুনিশ্চিত করা হয়। এখানে জবাবদিহিতার কৌশলগত প্রক্রিয়াটিকে একটি চক্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল-

ছক : জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াগত কৌশল

চক্রের তথ্য উৎস:

উপরোক্ত চক্রের কৌশলটি প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

## উপসংহার

স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হিসাবে এনসিটিবি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের অব্যাহত প্রক্রিয়া মাধ্যমে, শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে তথা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আবার শিক্ষা বোর্ড ব্যাপক কর্মকান্ড সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মত দুটি মূল কার্য পালন করে আসছে।

জবাবদিহিতার সাথে নীতিবোধ, স্বচ্ছতা এবং পেশাদারিত্বের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। যিনি নীতিবোধ সমৃদ্ধ, স্বচ্ছতার অনুশীলন করেন তিনি যথার্থ আইন মেনে চলেন। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অনুশীলনের উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছে। কার্যকর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

### ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শীর্ষে নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্বে থাকেন?
ক. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গ. শিক্ষা বোর্ড
ঘ. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।

২. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা হিসাবে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ হল-
i. নায়েম
ii. শিক্ষাবোর্ড
iii. এনসিটিবি
নীচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৩. প্রশাসনিক জবাবদিহিতর গুরুত্বের কারণ-
i. প্রশাসনিক দুর্নীতি হ্রাসকরণ
ii. স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করা যায়
iii. নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ সক্রিয় করা যায়
নীচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

**উত্তরমালা:** ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ

### খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. স্বায়ত্বশাসন বলতে কী বোঝায়?
২. জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়?
৩. জবাবদিহিতার উদ্দেশ্যসমূহ লিখুন।
৪. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

## গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সমূহের কতটুকু কার্যকর ভূমিকা আছে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

২. শিক্ষা প্রশাসনে জবাবদিহিতার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে জবাবদিহিতা নির্ভর পরিপূর্ণ কর্মদক্ষতার ফসল- ব্যাক্যা করুন।

৪. কার্যকর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা অর্জনে প্রক্রিয়াগত কৌশলের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

# পাঠ ২.৪: ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা– পরিকল্পনা, সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্তৃত্ব অর্পন

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা কী তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার প্রকারভেদ বর্ণণা করতে পারবেন।
- পরিকল্পনা কী এবং কীভাবে কার্যকর করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংগঠিতকরণের দক্ষতা অর্জনের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নেতৃত্ব বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবে ব্যবস্থাপনায় নেতার ভূমিকা রাখে তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- নিয়ন্ত্রণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ কীভাবে কার্যকর করা যায় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- কর্তৃত্ব অর্পন কী এবং কীভাবে ফলপ্রসূ করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ভূমিকা

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা কাজে লাগানোর মাধ্যমে সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়। সাধারণত দক্ষতা বলতে ব্যক্তির কার্যসম্পাদনের সামর্থ্য বা যোগ্যতাকে বুঝায়। কোন ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হলেই তাকে দক্ষ বলা চলে। অর্থাৎ ন্যূনতম অর্থ, সময়, উপায়, উপকরণ ও সামর্থ্য ব্যয় করে সর্বাধিক সফলতার সাথে নৈপূর্ণতা প্রদর্শন করাকেই ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বলে। ব্যবস্থাপনা এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে সর্বাধিক দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার সাথে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। ব্যবস্থাপনা হলো একটি অবিরাম কর্ম প্রক্রিয়া। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির মধ্যে প্রথমত: পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগঠিতকরণ, নেতৃত্বদান, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা অর্পন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এসব কার্যাবলি পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদসমূহ (যথা মানব-সম্পকীয়, আর্থিক, ভৌত এবং তথ্য সম্পদকে) কাজে লাগানোর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ফলপ্রসূ উপায়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা। তাই একজন ব্যবস্থাপককে এসব কার্যাবলির দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আরও কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

## ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কার্যসমূহ সুনিপূর্ণভাবে পরিচালনা করার প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনীয় দক্ষতা বলে। তবে ঝশরহহবৎ ধহফ ওাধহপবরপয এর মতে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বলতে বুঝায় কার্য-সম্পাদনে জ্ঞান, আচরণ এবং আগ্রহকে ব্যবহারের সামর্থ্য। (Management skills means the ability to use knowledge behaviours and aptitudes to perform a task).

আবার পিটার এফ ডাকার (Peter F Dakar) স্পষ্ট করে বলেছেন- কীভাবে সঠিক কাজটি করা যাবে ব্যবস্থাপকের দক্ষতা নির্ণয়ে তা মূখ্য বিষয় নয় বরং করণীয় সঠিক কাজ কোনটি তা নিরূপণ করে তা সম্পাদনের জন্য সম্পদ ও

শক্তি কীভাবে সংগ্রহ ও সমন্বিত করা যাবে এটি তার সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা হলো প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, উপায়-উপকরণকে সঠিকভাবে সংহতকরণ, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে উপযুক্ত জনবল সংগ্রহ ও তাদের উন্নয়ন, যথাসময়ে যথাযথ নির্দেশ প্রদান, কার্যকর তত্ত্বাবধানে, নেতৃত্বদান সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রণোদিতকরণ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ কার্য যাতে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করা যায়। ব্যবস্থাপকীয় সাফল্য অর্জনের জন্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী একজন ব্যবস্থাপকের নিম্নোক্ত দক্ষতা থাকা বা অর্জন করা আবশ্যক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. **কারিগরি দক্ষতা:** প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে কোন কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান, পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তা সঠিকভাবে ব্যবহারের ক্ষমতা কারিগরি দক্ষতা হিসেবে গণ্য। কার্য সম্পাদনে যন্ত্রপাতি ও সম্পদের ব্যবহার এবং সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপককে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের নিচের দিকে ও মধ্যম পর্যায়ে কর্মরত নির্বাহীদের কারিগরি জ্ঞান বা দক্ষতায় অধিক প্রয়োজন। একজন সফল ব্যবস্থাপককে অধীনস্তদেরকে দিয়ে কীভাবে কার্য-সম্পাদন করাবেন তার জ্ঞান রাখতে হবে।

২. **মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা:** ব্যবস্থাপক কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেন বিধায় অধস্তনদের সাথে কাজ করা, তাদের আবেগ, অনুভূতি, মনোভাব ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা বোঝা এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ক্ষমতা মানবীয় সম্পর্ক দক্ষতা হিসাবে গণ্য হয়। সফল ব্যবস্থাপককে তার উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

৩. **ধারণামূলক বা অনুধাবন দক্ষতা:** প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনুমান করতে হয়। সঠিক অনুমান করতে পারার বা সম্ভাব্য যে সকল অবস্থা ঘটতে পারে আগাম সেই সম্পর্কে ধারণা করতে পারার সামর্থ্য এ ধরণের দক্ষতার মধ্যে পড়ে। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে কীভাবে সমন্বয় সাধন করবে, অবস্থা কী দাঁড়াবে, কোন ধরণের সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে আগাম ভাবতে পারাও এরূপ দক্ষতার আওতাধীন। এ প্রসঙ্গে Prof. R.W. Griffin-এর মতে Conceptial skills depends on the manager's ability to think in the abstract. অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে চিন্তা করার ব্যবস্থাপকের ক্ষমতার উপর ধারণামূলক দক্ষতা নির্ভর করে। তাই সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমাঞ্জস্য বিধানের কৌশল সম্পর্কে ব্যবস্থাপকের দক্ষতা থাকতে হবে।

৪. **সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান দক্ষতা:** সমস্যা নির্ণয়িক দক্ষতা যা ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সমস্যা চিহ্নিত করে যে কোন পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে সাড়া প্রদানের মাধ্যমে সমাধানে সক্ষম করে তোলে। আবার সমস্যা সমাধানে বিকল্প পন্থা থেকে সঠিক ও কার্যকর পন্থাটি সম্পর্কে ব্যবস্থাপককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সমস্যা নির্ণায়ক বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা অর্জনে প্রত্যেক স্তরের ব্যবস্থাপকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা:** ব্যবস্থাপনার সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও কলাকৌশলের প্রয়োগ সম্পর্কিত দক্ষতাকে বিশ্লেষণমূলক দক্ষতার আওতাধীন। অর্থাৎ সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষমতা, কীভাবে তা পারস্পরিক সম্পর্কিত এবং বিশেষ অবস্থায় এসব সমস্যা কী ভূমিকা রাখতে পারে তা ব্যবস্থাককে বোঝার সামর্থ্য থাকতে হবে। এজন্য ব্যবস্থাপককে সমস্যা সম্পর্কে অনুধাবন করে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ব্যবস্থাপকের দীর্ঘ স্থায়ী সফলতা অর্জনের জন্য বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৬. **যোগাযোগ দক্ষতা:** প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থাপককে যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। সহজভাবে বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে লিখিত ও মৌখিক তথ্য প্রেরণে কার্যকর যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ব্যবস্থাপকের কার্য-সম্পাদনকে ফলপ্রসূ করে

তুলতে সাহায্য করে। ব্যবস্থাপককে তার ধারণা ও তথ্য অধস্তন কর্মীদের নিকট জ্ঞাত করানো এবং অধস্তনদের ধ্যান-ধারণা ও পরামর্শ গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। এজন্য ফলাবর্তন ব্যবস্থার ব্যবহার এবং কর্মীদের অনুপ্রাণিতকরণের জন্য উর্দ্ধমূখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দক্ষতা অর্জন বাঞ্ছনীয়।

৭. **কম্পিউটার বিষয়ক দক্ষতা:** আধুনিক অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপককে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফ্টওয়ার, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন অত্যাবশ্যক। বর্তমানে অফিস ব্যবস্থাপনা তথ্য ও প্রযুক্তি কার্যকর করে তুলছে। ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কম্পিউটার দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অর্জন যা প্রশাসককে কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাছাড়া ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির সম্পর্কিত দক্ষতা নিম্নে আলোচনা করা হল।

## ক. পরিকল্পনা (Planning)

ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার শুরুতে প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের অগ্রিম রূপরেখা তৈরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হলো প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নকশা প্রণয়ন করা। এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির রূপরেখা যা বাস্তবায়নে কি করতে হবে, কখন, কোথায়, কার দ্বারা ও কীরূপে করতে হবে তার নকশা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হয়। পরিকল্পনা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করে না বরং প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত সম্পাদাদির ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের অতীত অভিজ্ঞতা ও তথ্যাদির আলোকে প্রণীত হয়। বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরী ফয়েল (Henrey Foyel) বলেন, "The plan of action is, at one and the same time the result envisaged, the line of action to be followed the stage to go through and the methods to use." অর্থাৎ সে কর্মপন্থা গৃহীত হবে তা, যে সকল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সেটা চলবে তা এবং যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা নির্ধারণ করা এবং ঐ একই সময়ে ফলাফল বিচার করা।

আইরিচ ও কুঞ্জ (Irish and Katz)-এর মতে "Planning involves selecting mission and objectives and the action to achieve them; it requires decision making that is choosing from alternative future course of action." অর্থাৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি নির্বাচন এবং তা অর্জনের কর্মপন্থা গ্রহণের সাথে পরিকল্পনা সংস্পৃক্ত; এজন্য প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহন অর্থাৎ ভবিষ্যৎ করণীয় বিকল্প কর্মপন্থাগুলোর মধ্যে থেকে উত্তমটি নির্বাচন করা হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের বিশ্লেষণ করে বলা যায় পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ করণীয় কী তা আগাম নির্ধারণ করা এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা করণীয় সকল কাজের পূর্বেই নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া।

### পরিকল্পনাকে কার্যকরী বা ফলপ্রসূ করার উপায় বা দক্ষতা অর্জনের উপায়

কোনা পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালিত হয়। তাই পরিকল্পনার কার্যকারিতা উপর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য কার্যাবলির সফলতা নির্ভর করে। নিম্নে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধির উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধন (Co-ordination in the Planning):** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগের জন্য মূল পরিকল্পনার

অধীনে কতিপয় ক্ষুদ্র পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধিা লক্ষ্যে মূল পরিকল্পনা ও ক্ষুদ্র পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। গৃহীত পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত এবং যথাযথ কৃর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগ এব কার্যের মধ্যে সুসমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। মূখ্য, গৌণ ও সহায়ক পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সমন্বয় বিধান করতে হবে। এর ফলে গৃহীত পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

২. **যোগাযোগ উন্নয়ন (Development of Communication):** পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে যোগাযোগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, কৌশল (Strategy), নীতি, পরিকল্পনা, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি ও পরিকল্পনা আঙ্গিনা প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের নির্বাহী ও প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সর্বস্তরের কর্মীদেরকে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করতে হবে। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এর ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

৩. **পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণ (Participation in Preparing Plans):** পরিকল্পনা প্রণয়নে অধস্তন নির্বাহী বা ব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে পরিকল্পনায় নির্বাহীদের সরাসরি অংশগ্রহণ বা প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে অংশগ্রহণকারী নির্বাহীগণ মনে করেন যে, গৃহীত পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্মসূচি বা সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের। তাই তারা পরিকল্পনার কার্যকর বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকে। ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. **পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ (Overcoming the Limitations of Planning):** পরিকল্পনার নানাবিধ অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন- সঠিক পূর্বানুমানের অভাব, দ্রুত পরিবর্তনের অসুবিধা, কর্মচারীদের আচরণে অনমনীয়তা, সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল প্রভৃতি অন্যতম। পরিকল্পনার এসব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৫. **তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা (Data Based Planning):** পরিকল্পনা প্রণয়ন অবশ্যই সঠিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত হয়ে বিষয়ের উপর সঠিক পূর্বানুমান করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত। এর ফলে পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

৬. **সর্বোচ্চ স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ (Planning at the Top Level):** ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তরে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। যেহেতু প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে অন্যান্য সহায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেহেতু প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্তরের কর্মকর্তাগণের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, বুদ্ধি-মত্তা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতিফলন পরিকল্পনায় থাকতে হবে। পরিকল্পনার ফলপ্রসূতা আনয়নে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭. **সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য (Clear Objective):** পরিকল্পনা প্রণয়নকালে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রণেতার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

৮. **সচেতনতার উন্নয়ন (Developing Awareness):** গৃহীত পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করতে হবে। কর্মীরা যাতে পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নীতি, কৌশল, প্রকল্প আঙ্গিনা ইত্যাদি সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন করে তুলতে হবে। পরিকল্পনা সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট হলে এর বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

৯. **পরিবর্তনশীলতা (Flexibility):** পরিকল্পনার প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধনী গ্রহণ এবং পরিবর্তনের সুযোগ থাকা আবশ্যক। সৃষ্ট বাস্তব অবস্থার কারণে এবং যে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা সংশোধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং কর্মীরা যাতে উক্ত পরিবর্তন সহজে মেনে নেয় তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

একজন ব্যবস্থাপক যদি উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও চর্চা করেন তবে তার ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা সুদৃঢ় হবে।

## খ. সংগঠিতকরণ (Organizing)

কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য এর জনশক্তিকে সংগঠিত করতে হয়। এই সংগঠিত জনশক্তি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাস্তব ভূমিকা পালন করে। সংগঠন হচ্ছে উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলির বিভাগ ও শ্রেণিবদ্ধকরণ, দায়িত্বসমূহের সংজ্ঞা নিরূপণ, নির্বাহী কর্মীদের মধ্যে কর্তৃত্ব বন্টন ও ক্ষমতার্পন এবং তাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাতে তারা নিজ নিজ দায়িত্বসমূহ যথাযথরূপ পালনে সক্ষম হয়। নিউম্যানের মতে, "পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যকীয় কার্যাবলিকে বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা বিভক্ত করা এবং এই শাখাসমূহের সাথে জড়িত কার্য-নির্বাহী ও কর্মীদের ভিতর সম্পর্ক স্থির করার প্রক্রিয়া হল সংগঠন"। সংগঠন জনশক্তি ও জড় উপাদানের সাথে জড়িত। আবার সংগঠন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাকফারল্যান্ড বলেন; "Management organization is best defined as the structure or network of relationships among individuals and position in a work setting and the processes by which the structure is created, maintained and used". অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা সংগঠন হলো কতিপয় কর্মরত ব্যক্তি ও পদের কাঠামো বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি নেটওয়ার্ক এবং একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা কাঠামোটি সৃষ্ট, সংরক্ষিত এবং ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মানবীয় ও অমানবীয় উপকরণাদি সমন্বয় সাধন অমানবীয় উপকরণাদি সমন্বয় সাধন ও সুসংহতকরণের প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা সংগঠন বলা হয়ে থাকে। সংগঠন ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যথাযথ সংগঠন প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী সংগঠন কাঠামো কাম্য ক্ষমতার সাথে পরিকল্পিত উদ্দেশ্যাবলী সামঞ্জস্য ঘটিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অর্জনে সংগঠনকে উত্তম ভাবে সংগঠিত করণের জন্য ব্যবস্থাপকের দক্ষতা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। উত্তম সংগঠনের বৈশিষ্ট্যের আলোকে নিম্নে বর্ণিত দক্ষতা অর্জনের কৌশল তুলে ধরা হলো।

- প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সংগঠন কাঠামো গড়ে তোলা হয়। তাই সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকার সামর্থ্য অর্জন করতে হয়।
- সংগঠন এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে সহজবোধ্যতা থাকে। এতে একটি সংগঠনের চার্ট বা ডায়াগ্রাম দেখে সবাই যেন এর উচ্চতর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পদ, পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তৃত্ব শৃঙ্খল (Chain of Command) ইত্যাদি বিষয়ে পেতে পারে। এজন্য সহজবোধ্যতা প্রকাশে ক্ষমতা/দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- একটি সংগঠনের কাজগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে প্রতিষ্ঠানের বিশেষায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশেষায়ন সম্পর্কে কেট ডেভিস (Kate Devis) বলেছেন "কোনো ব্যক্তি বা বিভাগ যদি একই ধরণের কাজে সামর্থ্য ব্যয় করে তবে ঐ কাজে তার পক্ষে দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। তাই সংগঠনের ক্ষেত্রে কার্যবিভাজন যথাযথভাবে সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়।
- একটি শক্তিশালী সংগঠন কাঠামো গড়ে তুলতে হলে কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমতা বিধান করার প্রয়োজন। দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও তার যথাযথ অনুসরণ একটি উত্তম সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দিক। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের উপর প্রতিটি বিভাগের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমতা বিধানের দক্ষতা থাকা একান্ত আবশ্যক।
- সংগঠনের ভারসাম্যপূর্ণতা, যাতে হয় সেজন্য বিভাগ ও উপবিভাগ এমনভাবে সৃষ্টি করতে হয় যাতে প্রত্যেকটি বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও একে অন্যের সহযোগী হয়ে উঠতে পারে।

- বিভিন্ন সময়ে নির্বাহী কর্তৃক অধঃস্তন কর্মীর উপর জারিকৃত নির্দেশনার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। তাই সংগঠন কাঠামোতে নির্দেশনার ঐক্যের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রত্যেক নির্বাহী কতজন অধঃস্তন কর্মীর কার্যাবলি দক্ষতার সাথে তত্ত্বাবধায়ক করতে পারবে তা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তত্ত্বাবধান পরিসর কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- একটি কার্যকর সংগঠনে আনুগত্য ও শৃঙ্খলা ভাবধারা সব সময়ই বজায় থাকে। প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট থাকায় প্রত্যেকেই যার যার কাজ সম্পাদন করে। এতে জবাবদিহিতা করার দ্রুত ও সহজতর হয়।
- সংগঠন কাঠামোতে বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের কার্য ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে শৃঙ্খলার সাথে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।
- সংগঠনের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে নমনীয়তা থাকা অপরিহার্য। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সংগঠন সামঞ্জস্য বিধান করা দক্ষ সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- ব্যবস্থাপনা সংগঠন প্রতিষ্ঠায় দক্ষতার বিষয়টি সবসময়ই সামনে রাখতে হয়। রিচ ও কুঞ্জ এর মতে "কর্মশক্তি ও উপায় উপকরণ ব্যয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনই হলো দক্ষতা" সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানে যেখানে যে বিভাগ খোলা প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রত্যেকের জন্য সেভাবে নির্বাচন করা উচিত, সম্পর্ককে সেভাবে ঠিক করে দেওয়া আবশ্যক। ফলে সবাই দক্ষতা সহকারে কার্য সম্পাদন করতে পারে।

## গ. নেতৃত্বদান (Leading)

নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আবার নেতৃত্ব প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার একটি অবশ্য অনুষঙ্গ। কোনো দল বা গোষ্ঠীর আচরণ ও কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকেই নেতৃত্ব বলা হয়। যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তাকে নেতা বলা হয়। আবার তিনি তার নেতৃত্বদানের মধ্যে দিয়ে কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্ত সহকর্মীদের কার্যাদি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে পরিচালনা করেন বিধায় ব্যবস্থাপককে নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রতিষ্ঠানে অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের নেতৃত্বের প্রয়োজন। কাজেই একজন শিক্ষা প্রশাসক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নেতৃত্ব দেবেন বা নেতার ভূমিকা পালন করবেন।

নেতৃত্ব শব্দটি সংগঠন, দল বা প্রতিষ্ঠানের কর্ম-সম্পাদনে প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এটি এমন একটি শক্তি সব প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের মাঝে প্রভাবকের কাজ করে এবং তাদেরকে কর্মে উদ্দীপ্ত করে। নেতৃত্বকে একটি প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়ায় যার মাধ্যমে নেতা তার নির্দেশনা, পরামর্শ কৌশল এবং সর্বপরি তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা দলের সদস্যদের আচার-আচরণ ও মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, নেতৃত্ব হল প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনের জন্য অধস্তন কর্মীদের আচরণ ও কার্যাবলির উপর প্রভাব বিস্তারের একটি প্রক্রিয়া। অতএব নেতৃত্ব মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদেরকে পরিচালনা করা, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

### কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের সক্ষমতা

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নেতাকে বিভিন্নমুখী সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। নেতাকে তার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কার্য-সম্পাদন করতে হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ (To Take Decision):** প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নেতৃত্বকে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। পরিবর্তিত অবস্থায় কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নেতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে কর্মীদের সঠিক পথে পরিচালিত করা নেতার দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

২. **উপযুক্ত সংগঠন প্রণয়ন (Designing Sound Organization):** প্রতিষ্ঠানের নীতি, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপযোগী একটি কার্যকর সংগঠন তৈরি করা নেতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই নেতৃত্বকে কার্যোপযোগী একটি সঠিক সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন করার কৌশল আয়ত্ব করতে হয়।

৩. **উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা ও অবহিতকরণ (Establishing Objectives and Communicating):** নেতাকে তাঁর দলীয় উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে তা অধস্তনদের সঠিকভাবে অবহিত করতে হবে। উদ্দেশ্যের কার্য-কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক তা অধস্তনদের সামনে তুলে ধরলে অধস্তনগণ উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা উপলব্ধি করে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠবে। এজন্য উদ্দেশ্য নির্ধারণে অধস্তনদের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক।

৪. **নির্দেশনা বা পরিচালনা (To Guide or Direct):** অধস্তনদের কার্যাবলি সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নেতাকে সঠিক ও কার্যকর নির্দেশনা মাধ্যমে অধস্তনদের নিকট নেতা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই সঠিক নির্দেশনা প্রদান নেতৃত্বের একটি প্রধান কাজ। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সুনির্দিষ্ট ও সুবর্ণিত নির্দেশনা দানের মাধ্যমে নেতা তার অধস্তনদের কার্য-সম্পাদনে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে থাকে।

৫. **তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ (Supervision and Control):** প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের পথে অধস্তনদের পরিচালিত করা নেতার দায়িত্ব। তাই নেতৃত্বকে অবশ্যই অধস্তনদের কাজ দেখাশুনা বা তদারক করা আবশ্যক। সুষ্ঠু ও কার্যকর তত্ত্বাবধান কর্মীকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য-পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা অধস্তনদের কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

৬. **অধস্তনদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি (Building Confidence of the Subordinates):** নেতার ব্যক্তিত্ব, সততা, মূল্যবোধ এবং কার্যক্ষেত্রে সহায়তা দানের মাধ্যমে নেতৃত্বের প্রতি অধস্তনদের আস্থা সৃষ্টি করা যায়। অধস্তনদের মনে আস্থাবোধ সৃষ্টি করা নেতৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কার্য-সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবহিতকরণ, চাকরির নিরাপত্ত দান, কার্যকর তত্ত্বাবধান, ব্যক্তিগত উৎসাহ, সহযোগিতা ও পরামর্শ দান ইত্যাদির মাধ্যমেও অধস্তনদের মনে আস্থাবোধ জাগিয়ে তোলা সম্ভব। আস্থাবোধ সৃষ্টি ও জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে কর্মীর মনোবল উন্নত করা যায় এবং প্রতিষ্ঠানে কাজের গতিশীলতা আনয়ন করার সার্মথ্য অর্জনে চেষ্টা করতে হয়।

৭. **বিরোধ নিস্পত্তি (To Settle Dispute):** অধস্তনদের মতবিরোধ নিস্পত্তিতেও নেতা মধ্যস্থকারীর ভূমিকা পালন করেন। যে কোন বিষয়ে অধস্তন কর্মীদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে নেতা বিরোধ নিস্পত্তির দায়িত্ব পালন করেন এবং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দক্ষতা থাকতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় কর্মীদের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি সৃষ্টি করা, অধস্তনদের কর্তব্য সম্পাদনে গতি সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়া, সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের ইঙ্গিত দান, কর্মীদের যথেষ্ট প্রেষণা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগান, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, দল বা সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি কার্যসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদনের মাধ্যমে অধস্তন বা অনুসারীদের মধ্যে নেতা তাঁর স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে।

## ঘ. নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ এবং ত্রুটি বিচ্যতি নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ পরিকল্পনার ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে

সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় আদর্শ মান প্রতিষ্ঠা করা হয়, প্রতিষ্ঠিত মানের সাথে অর্জিত ফলের তুলনা করা হয়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া। নিয়ন্ত্রণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সার্বিক কর্মকান্ডের প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাট্রন ও মার্টিন এর মতে- "Controlling is the process of regulating organizational activities so that actual performance out comes to expected organizational standards and goals". অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যাশিত মান ও লক্ষ্যের সাথে প্রকৃত কার্য-সম্পাদনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের পরিচালনার প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ বলে। অতএব বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি কার্যের পরিকল্পিত আদর্শ মান নির্ধারণ পূর্বক নির্ধারিত মানের সঙ্গে সম্পাদিত কার্যর অগ্রগতি ও কার্যফলের তুলনা এবং ত্রুটি বিদ্যুতি নিরূপণ ও এর কারণ অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার অন্যতম উপাদান হলো নিয়ন্ত্রণের কলা কৌশল অনুশীলন করা। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপককে ফলপ্রসূ নিয়ন্ত্রণের কলা-কৌশল বা শর্তাবলীর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

- নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনার একটি ধারাবাহিক ও অবিরাম প্রক্রিয়া এ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রণয়ন হতে শুরু করে এর যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
- প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মীর নিকট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই বোধগম্য হতে হবে। এজন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহজ সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগ থাকে। এসব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ। এ সকল নির্বাহী তাদের অধীনস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাই নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাকে উর্ধ্বতনের কাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
- প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। তাই অর্জিত কার্যকালের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।
- নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিতে কি ধরণের ত্রুটি, বিচ্যুতি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আগাম ধারণা বা ভবিষ্যৎ অনুমানের দক্ষতা থাকতে হবে।
- পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় রদবদলের প্রয়োজন হয়। ফলে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হয়। তাই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নমনীয় হতে হয়।
- সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শুধু বিচ্যুতিই র্নিধারণ করে না বরং উদঘাটিত ত্রুটি-বিচ্যুতির যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক বা নিরাময়মূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে। এতে সময়ের অপচয় রোধ হয় এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়।
- নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত মান সংখ্যাভিত্তিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক হওয়া আবশ্যক।
- নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সংগঠন কাঠামোর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অতএব বলা যায়, নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানের সমুদয় কার্যাবলির মধ্যে জটিল ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর প্রতি আদর্শমান সংরক্ষণ ও বজায় রাখার প্রতি বিশেষ নজর দিতে সক্ষম হয়। মান বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সঠিক সময় তা নিরূপন করে বিপর্যয় রোধ করার পদক্ষেপ নির্ধারনে সহায়ক হয়।

## ঙ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision Making)

প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং উদ্ভূত সমস্যাবলির সমাধানের নিমিত্তে বহুবিধ বিকল্প পন্থার মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা উত্তম পন্থাটি সচেতন বাছাইকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলা যায়।

বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ কট্রল ও মার্টিন এর মতে, "Decision making is the process through which managers identify organizational problems and attempt to resolve them". অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যবস্থাপকগণ সাংগঠনিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের প্রচেষ্টা চালান।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যবস্থাপকগণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ ও নিজেদের চিন্তা চেতনাকে কাজে লাগিয়ে সর্বোত্তম উপায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম নির্ধারণ করা। এক কথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো কতগুলো বিকল্প কর্মপন্থা থেকে সর্বোত্তম কর্মপন্থা ঠিক করে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া। এই সচেতন ও যৌক্তিক বাছাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিন্তাভাবনা তথা মানসিক চর্চা জড়িত। মানসিক ও মস্তিস্ক চর্চার সমন্বিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে মানসিক প্রক্রিয়াও বলা চলে।

### ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃতি এবং কার্যকর করার উপায়

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম মৌলিক প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম। মূলত ব্যবস্থাপনার কাজই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপনায় মৌলিক কার্যাবলি, যেমন– পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব ও নির্দেশনা এবং নিজের কার্যক্রম মূলত দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনার সফলতা ও বিফলতা মূলত সঠিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। পিটার এফ ড্রাকার বলেছেন, "Whatever a manager does, be does through making decision". অর্থাৎ ব্যবস্থাপক যা করেন তা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই করে থাকেন। এজন্য অনেক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ব্যবস্থাপনার "প্রাণ" বলা হয়ে থাকে। তাই ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যকর করার বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নির্দিষ্ট কার্যের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- অযৌক্তিক ও অবাস্তব বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে এর যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রাখা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করা;
- পূর্বের অভিজ্ঞতার আলোকে সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূতা যাচাই করে বর্তমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা অধঃস্তনদের নিকট গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করে সেটা লক্ষ্য রাখা;
- প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করে বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবশ্যই অভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং এর প্রতিক্রিয়া যথাযথভাবে বিবেচনা করা;
- পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশোধনের ব্যবস্থা বা নমনীয়তার সুযোগ রাখা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে ঝুঁকির অনুপাত বিচার বিশ্লেষণ করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে এর বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সম্পদের সুযোগ সুবিধা বিষয়টি বিবেচনা এনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

তাছাড়া কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সেগুলো হলো– (১) সমস্যা চিহ্নিতকরণ, (২) সমস্যা বিশ্লেষণ, (৩) বিকল্প সনাক্তকরণ, (৪) বিকল্প বিশ্লেষণ (নিশ্চিত অবস্থা, ঝুঁকি অবস্থা ও অনিশ্চিত অবস্থা), (৫) বিকল্প নির্বাচন/সিদ্ধান্ত গ্রহণ, (৬) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বা কার্যকরীকরণ, (৭) মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ। একজন ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

## চ. ক্ষমতা অর্পন বা কতৃত্ব অর্পন (Power Delegation)

একটি বিস্তৃত ও জটিল সংগঠনকে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হলে সেখানে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা অর্পনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোন সংগঠনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তনদের মধ্যে কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পন করার পদ্ধতিকে কর্তৃত্ব অর্পন বলা হয়। এ ব্যবস্থায় উর্ধ্বতন নির্বাহী বা কর্মকর্তার কর্তৃত্বের অংশ বিশেষ অধস্তনদের মাঝে বন্টন করে থাকে। কর্তৃত্ব অর্পন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর হতে ক্রমান্বয়ে নিম্নস্তরের দিকে নেমে আসে। কর্তৃত্ব অর্পন বলতে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক বা নির্বাহী কর্তৃক অধস্তন কর্মীর উপর কর্তৃত্বসহ কার্যের অংশ বিশেষের দায়িত্ব অর্পনকে বোঝায়। কর্তৃত্ব অর্পন দ্বারা ব্যবস্থাপক তার ক্ষমতা বন্টন করেন এবং অধীনস্তদের উপর কি দায়িত্ব অর্পন করা হবে তা নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় কর্তৃক প্রদান করে।

অধ্যাপক আর ডব্লিউ গিফিন এর মতে, "Delegation is the process by which a manager assigns a position of his a her total work load to others". অর্থাৎ কর্তৃত্ব অর্পন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা একজন ব্যবস্থাপক তার সমুদয় কাজের একটি অংশ অপরের কাছে অর্পন করে। মুনি (Monney)-এর ভাষায়- "Delegation means conferring of specified authority from a higher to lower authority". অর্থাৎ কর্তৃত্ব অর্পন হল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধস্তন কর্তৃপক্ষের নিকট সুনির্দিষ্ট কিছু কর্তৃত্ব অর্পন। যার ফলে অধস্তন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার নিকট হস্তান্তরিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা ভোগ করার আইনগত অনুমতি প্রাপ্ত হন। যদিও তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত থাকেন।

সুতরাং বলা যায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন নিশ্চিতকরণে উর্ধ্বতন নির্বাহী বা কর্মকর্তা কর্তৃক অধস্তনদের কোন নির্দিষ্ট কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পনসহ কর্তৃত্ব অর্পন করে থাকে।

## কর্তৃত্ব অর্পন ফলপ্রসূ করার উপায়

কর্তৃত্ব অর্পন প্রক্রিয়াকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে একজন ব্যবস্থাপকে নিম্নে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে-

- কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে অধস্তনদের ক্ষমতা অর্পন করা হলে উর্ধ্বতন ও অধস্তন সম্পর্ক অটুট রেখে কর্তৃত্ব অর্পন প্রক্রিয়ার সফল বাস্তবায়ন লাভ;
- প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে বিভক্তি করে কর্মদক্ষমতা অনুযায়ী নির্বাহীদেরকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করা;
- উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা অধস্তনদের কর্তৃত্ব গ্রহণে উৎসাহী করে তোলে এবং এর ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অধস্তনদের মতানৈক্য দূরীভূত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ অধস্তনদের কর্তৃত্ব অর্পনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা দেয়া;
- অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তির নিকট কতৃত্ব অর্পনের লক্ষ্যে যথেষ্ট যোগ্যতা ও অভীক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচন করা।
- কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমতা বিধানের লক্ষ্যে অধস্তনদের যতটুকু দায়িত্ব অর্পন করতে হবে ঠিক ততটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর করা;
- সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাহী বা ব্যবস্থাপককে যথাযথ তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- কর্তৃত্ব অর্পন প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ ও অধস্তনদের নিকট কর্তৃত্ব অর্পন গ্রহণ যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্য কর্মীদের মাঝে প্রেষণা দানের ব্যবস্থা করা;
- ফলপ্রসূ কর্তৃত্ব অর্পনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন অধস্তনদের মধ্যে মুক্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা করা;
- উর্ধ্বমূখী ও নিম্নমূখী যোগাযোগের সফল প্রয়োগ উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে কর্তৃত্ব অর্পন ও রিপোর্ট গ্রহণ প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে তোলা;
- অধস্তনদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্তৃত্ব অর্পন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- অধস্তন কর্মীদের দায়িত্ব অর্পন করে এবং প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব দিয়ে উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জবাবদিহিতার সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য অধস্তনদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা;
- কর্তৃত্ব অর্পন প্রক্রিয়া ফলাবর্তনে সুযোগ সৃষ্টি করা এবং যথাথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য মান নিয়ন্ত্রণ করা।

## উপসংহার

ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপককে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কতিপয় ভূমিকা পালন করতে হয়। একজন ব্যবস্থাপককে সংগঠনের চাহিদা মাফিক কতিপয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। ব্যবস্থাপককে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যবিধি যেমন- পরিকল্পনা, সংগতিকরণ, নেতৃত্ব দান, নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতা অর্পন কার্যকর ব্যবস্থা করে তুলতে ব্যবস্থাপকীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। অর্থাৎ তাকে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নানাবিধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ব্যবস্থাপককে প্রথমে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে সংগঠন ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বদান এবং নিয়ন্ত্রণ কার্য-সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে হয়। আবার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ব্যবস্থাপককে কর্তৃত্ব অর্পন করার প্রণালী ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপকগণ মৌলিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সংগত কারণেই সফলতার মতো দৃশ্যমান বিষয়ক ব্যবস্থাপকীয় কর্ম প্রচেষ্টার সাফল্য দক্ষতার প্রত্যাশিত ফল হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

### ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. প্রাতিষ্ঠানিক সার্মথ্য ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা যথাযথভাবে–
   i. পরিকল্পনা গ্রহণ
   ii. উপায়-উপকরণ
   iii. নির্দেশ প্রদান
   **নীচের কোনটি সঠিক?**
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

২. ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা কতভাবে বিভক্ত করা যায়?
   ক. ৫
   খ. ৬
   গ. ৭
   ঘ. ৮

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নির্বাচন এবং তা অর্জনের কর্মপন্থা গ্রহণের সাথে পরিকল্পনা সম্পৃক্ত- এই উক্তিটি কার?
   ক. হেনরী ফয়েল
   খ. আইরিচ ও কুঞ্জ
   গ. কট্রল ও মার্টিন
   ঘ. এম এইচ নিউম্যান

৪. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মানবীয় ও প্রাপ্ত উপকরণাদির সুশৃঙ্খল সমন্বয় বিধানের প্রক্রিয়াকে কি বলে?
   ক. পরিকল্পনা
   খ. নেতৃত্বদান
   গ. সংগঠন
   ঘ. কর্তৃত্ব অর্পন

৫. নেতাকে তার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কার্য-সম্পাদন-
   i. সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   ii. উপযুক্ত সংগঠন প্রণয়ন
   iii. তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ
   নীচের কোনটি সঠিক?
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন বিকল্প পন্থা যাচাই এর কারণ কি?
   ক. সময় কম লাগে
   খ. দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য
   গ. সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন সহজ হয়
   ঘ. তথ্য সংগ্রহ সহজ হয়
৭. মুনির মতে কর্তৃত্ব অর্পন বলতে কী বোঝায়?
   ক. ক্ষমতার পূর্ণ হস্তান্তরকরণ
   খ. সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা অর্পন
   গ. নির্বাহী কর্তৃত্ব অন্য নির্বাহীকে ক্ষমতা প্রদান
   ঘ. আংশিক ক্ষমতা অর্পন

**উত্তরমালা:** ১. খ, ২. গ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. খ, ৬. গ, ৭. খ

## খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা বলতে কী বোঝায়?
২. পরিকল্পনা কী?
৩. ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
৪. কীভাবে সংগঠিতকরণ করা হয়?
৫. নেতৃত্বদানের কৌশলসমূহ লিখুন।
৬. নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায়?
৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবস্থাপকের ভূমিকা বর্ণনা করুন?
৮. কর্তৃত্ব প্রদানের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন।

## গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।
২. পরিকল্পনা কী? কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. সংগঠন বলতে কী বোঝায়? উত্তম সংগঠনের আলোকে দক্ষতা অর্জনের কৌশলসমূহের কার্যকারিতা যাচাই করুন।
৪. কার্যকর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নেতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৫. নিয়ন্ত্রণের কৌশলের শর্তাবলী একজন ব্যবস্থাপককে কতটুকু প্রভাব রাখে তা ব্যাখ্যা করুন।
৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যকর উপায় ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা অর্জনের উপযোগিতা যাচাই করুন।
৭. কীভাবে কর্তৃক অর্পন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করা যায় সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

# পাঠ ২.৫ আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধন সভা সংগঠিতকরণ, সময় ব্যবস্থাপনা-উপস্থাপন-দল গঠন ও চুক্তি

# Inter-Departmental Co-oridnation Meeting Organization- Time Management-Presentation-Team Building and Negotiation

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফলপ্রসূ সভা সংগঠিতকরণের কার্যধারা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সময় নিয়ন্ত্রণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উপস্থাপনের দক্ষতাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- দলগঠনের মাধ্যমে আন্তঃ বিভাগের সমন্বয়ের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আন্তঃবিভাগের সমন্বয় সাধনে চুক্তি পূর্ব আলাপ-আলোচনার (Negotiation) অনুসরনীয় কাজগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

## ভূমিকা

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ ও ব্যক্তির কাজকে লক্ষ্যাভিমূখী করার প্রক্রিয়াকে সমন্বয় সাধন বলে। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় যাকে আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় সাধন বলা যায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যত বড় হয় কাজেই বিস্তৃতি তত বৃদ্ধি পায়। কাজকে ততই বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার প্রয়োজন পড়ে। এতে বিভাগ, উপ বিভাগ এর মাধ্যমে কাজগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং এক একটি কাজের জন্য এক একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে আন্তঃ বিভাগের কাজের বিস্তৃতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সমন্বয়ের বিষয়টা ততই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র বিভিন্ন বিভাগ ও উপ বিভাগের কাজের মধ্যেই সমন্বয় সাধন করলেই চলে না। বিভিন্ন মানবীয় ও বস্তুগত উপায় উপকরণের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করতে হয়। তাই এসব এর উপর নির্ভর করে বিভিন্ন বিভাগের লক্ষ্য বা পরিকল্পনার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করতে হয়। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি বিভাগের প্রচেষ্টাবলিকে একসাথে গ্রর্থিত, সংযুক্ত ও সুসংহত করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন উর্ধ্বতন প্রশাসক বা ব্যবস্থাপককে দায়িত্ব পালন করতে হয়। শুধু সময়ের জন্য বিভাগীয় প্রধানদেরকে নিয়মিত সভা সংগঠিত করতে হয়। এরূপ সভায় উর্ধ্বতন নির্বাহী ও উপ বিভাগীয় প্রধানদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত কার্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ে হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। অর্থাৎ সময়ের নির্দিষ্টতা সমন্বয়ের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। আবার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনসহ দলীয় চেতনাবোধের উন্মেষ ঘটানো সমন্বয়কের অন্যতম কাজ। এছাড়া আন্তঃ বিভাগের কর্মীদের সাথে কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা বা চুক্তি (Negatiation) বা পূর্ব আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে হয়। সমন্বয় দলীয় প্রচেষ্টা, ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয় একটি পৃথক অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত কার্য হলেও এর অন্যান্য কাজের মধ্যে আন্তঃবিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে। নিম্নে আন্তঃবিভাগের সমন্বয় সাধনের দক্ষতা সমূহ আলোচনা করা হলো:

## ক. সভা সংগঠিতকরণ (Meeting Organization)

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ ও উপ বিভাগের কার্যাবলি কার্য-সম্পাদনে বা উদ্ভত কোন সমস্যা মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভা সংগঠিত করতে হয়। অর্থাৎ আইনানুগ বিষয়ের উপর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা বিষয় সম্পৃক্ত একাধিক ব্যক্তির সমাবেশকে সভা বলা হয়। মূলতঃ সভা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সভা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে যেমন:

১. **সংবিধিবদ্ধ সভা:** আন্তঃবিভাগের (কাজের অগ্রগতি, মূল্যায়ন ইত্যাদি)
২. **তথ্য বিনিময়:** কোন অফিস আদেশ, নীতি নির্ধারণমূলক কোন নির্দেশ সবাইকে জানানো।
৩. **সমস্যা সমাধান:** আন্তঃবিভাগীয় কাজের জটিলতা বা উদ্ভদ্ধ কোন সমস্যা।
৪. **সৃজনমূলক বা চিন্তামূলক সভা:** প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক বা উদ্ভাবনমূলক কাজে পরিকল্পনা গ্রহণ।
৫. **পরিচালিত সভা:** গৃহীত সিদ্ধান্তকে আইনানুগ প্রদানের জন্য সভা।

আবার প্রকৃতিভেদে সভা বিভিন্ন হতে পারে যেমন- (১) সাধারণ সভা, (২) বিশেষ সভা, (৩) জরুরী সভা, (৪) তলবী সভা। সভা আহ্বান নিম্নে বর্ণিত তিনটি পর্যায়ে সংগঠিত হয়-

### ১. পরিকল্পনা ও প্রাথমিক পর্যায়

- সভার উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। যাতে সভা ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা যায়।
- সভার ব্যয় নির্ধারণের জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং খাতওয়ারী বরাদ্দ বিভাজক করা।
- অংশগ্রহণকারী নির্বাচন।
- সভার দিন, তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ করা।
- জনসংযোগ

### ২. সভার দ্বিতীয় পর্যায় নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো থাকবে-

ক) **আলোচ্যসূচী নির্ধারণ (Agenda):** উদ্দেশ্যভিত্তিক গুরুত্ব অনুযায়ী আলোচ্যসূচী ধারাবাহিকভাবে নির্ধারণ করা।

খ) **বিজ্ঞপ্তি প্রদান:** সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈধভাবে বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আলোচন্যসূচী, সভাপতির নাম ও পদবি, স্থান, তারিখ ও সময় ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

গ) **কর্মপত্র প্রণয়ন:** প্রতিটি আলোচ্য সূচীর অনূকূলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কর্মপত্রে বিষয়বস্তুর পটভূমি, প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত প্রচলিত আইন-বিধির সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

ঘ) **কক্ষ ব্যবস্থাপনা:** সভা পরিচালনার যাবতীয় বস্তুগত উপায় ও উপকরণ নিশ্চিত করা।

### ৩. সভা পরিচালনা

- সমন্বয়কের উপস্থাপনায় সভা পরিচালনা করা।
- সভাপতির সূচনা বক্তব্য এবং আলোচনা অংশগ্রহণে সব সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনা সমাপ্ত করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোগ নেয়া।
- সভায় অংশগ্রহণকারী আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা।

- কার্যবিবরণী লিখন। কার্যবিবরণীতে সভার শিরোনাম, স্থান, সময়, সভাপতির নাম ও পদবি উল্লেখ পূর্বক সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া সভায় উপস্থিত সদস্যদের নাম ও পদবী উল্লেখ করতে হবে।
- সভা সমাপ্তি।

তাছাড়া কার্যকর বা ফলপ্রসূ সভা ব্যবস্থাপনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

১. **সঠিক উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণঃ** সভার সকল সদস্য সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত থাকবেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবেন।
২. **সময় নিয়ন্ত্রণঃ** সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।
৩. **মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনঃ** অংশগ্রহণকারী সকলের মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান এবং যুক্তিযুক্ত মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা।
৪. **অংশীদারীত্বঃ** নিরপেক্ষভাবে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে যাতে মোটামুটি ভাবে সবার অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়।
৫. **মূল্যায়নঃ** সম্পাদিত কাজ যথাযথভাবে বিচার করা। সুন্দর ও সঠিকভাবে কৃত কাজের উপযুক্ত স্বীকৃতি ত্রুটিযুক্ত কাজের সমবেদনামূলক সমালোচনাও দরকার।
৬. **সুষ্ঠু প্রস্তুতিঃ** সভাপতি ও সভার আয়োজনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সকল প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হতে হবে।
৭. **তদারকিঃ** নিয়ম নীতি অনুসরণ ও বিধি মোতাবেক সভার কাজ চলে কিনা তা লক্ষ্য রাখা।
৮. **সমন্বয় সাধনঃ** বিভিন্ন কমিটি কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
৯. **রেকর্ড সংরক্ষণঃ** সভা অনুষ্ঠানের সকল স্তরের নথিপত্র সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়।
১০. **সঠিক নেতৃত্ব প্রদানঃ** সভা পরিচালনার সকল স্তরে দৃঢ়ভাবে নেতৃত্ব পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান।

আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধনে সভা পরিচালনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## খ. সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management)

প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্য-সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আন্তঃ বিভাগের কার্য সম্পাদনে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যাবলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ সময়কে সুষ্ঠু এবং যথাযথভাবে ব্যয় করার কৌশলগত প্রক্রিয়াই হলো সময় ব্যবস্থাপনা। আবার প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী বিভিন্ন বিভাগের কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে সময়কে যথার্থ বিভাজন ও বরাদ্দের মাধ্যমে কর্ম-সম্পাদন করার পরিকল্পনা করে থাকে। যাতে কম সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে সম্পন্ন করা যায়। সঠিক সময়ে নির্ধারিত পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কর্মসূচী যথার্থ বাস্তবায়নের জন্য সময় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময় ব্যবস্থাপনা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে কর্মসূচীগুলোর কার্য-সম্পাদন করলে কার্য-সফলতা আসে। কার্য-সফলতার মৌলিক চেতনা হল সঠিক সময়ে সঠিক কার্য-সম্পাদন। আন্তঃবিভাগের নির্বাহী ও অধঃস্তনদের কার্য-সম্পাদনে সময় নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. **গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরীঃ** প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন করতে হয় তার মধ্যে যে কাজটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সময় ব্যবস্থাপনা করতে হয়। ব্যবস্থাপক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগের কাজের তালিকা তৈরি করবেন এবং সেই মাফিক সময় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।
২. **গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরী নয়ঃ** প্রতিটি বিভাগের এমন কাজ আছে যা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরী নয়। সেক্ষেত্রে তালিকা প্রস্তুতি করে সময় নির্ধারণ করা যাতে সময়মত কার্য-সম্পাদন করতে পারে।

৩. **জরুরী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়:** প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের এমন কাজ সম্পন্ন করতে হয় কাজটি জরুরী কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন- সভা চলাকালীন সময়ে টেলিফোন আসা। এক্ষেত্রে অল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্পন্ন করা। ব্যবস্থাপক বা নির্বাহীর কাছে অনেক সময় এ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ নয় তবে জরুরী।

৪. **কীভাবে সময় ব্যয় করা:** নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন নির্ধারণ করার পন্থা হচ্ছে– Time Log ব্যবহার করা। এজন্য এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহের মধ্যে ১৫ মিনিট বিরতি দিয়ে কি কাজ করতে হবে তা রেকর্ড করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কতটুকু কার্য-সম্পাদন কাজে লাগাচ্ছে তা নির্ণয় করতে হবে।

৫. **পরিকল্পন ও উপকরণ ব্যবহার:** প্রতিষ্ঠানে সঠিক সময়ে সঠিক কাজের উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিকল্পনাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যক্তিগত পরিকল্পনার উদাহরণ যেমন- ইলেকট্রনিক পরিকল্পনা, পকেট ডায়েরী, ক্যালেন্ডার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, দেয়াল চার্ট ও নোটবুক অন্তর্ভূক্ত থাকবে। সঠিক সময় উল্লেখ করে একটি সিডিউল তৈরি করার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্য-সম্পাদন করা সহজতর হয়।

৬. **সময় সারণী বা কার্যকরী পরিকল্পনা:** প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ, উপরিভাগ ও অধস্তনের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট কাজের একটি বাৎসরিক কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এতে সুনির্দিষ্ট কাজ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কত সময়ে সম্পন্ন করবে, কতদিন কী কী সম্পদ প্রয়োজন এবং পরিমাপের নির্দেশক উল্লেখ থাকবে। এতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্য-সম্পাদনে সমন্বয় করা সহজতর হয়।

৭. **বহিঃস্থ কাজ:** প্রতিষ্ঠানের বাহিরে অনেক কাজ থাকে তা তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে অনেকটা সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৮. **তথ্যের জন্য সময়:** বর্তমানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ আছে তাদেরকে প্রতিদিন ফোন করার এবং ই-মেইল চেক করার নির্দিষ্ট একটি সময় বেছে নিতে হবে। ফোনের আলাপ, ওয়েবসাইট দেখা এবং ই-মেইল অনেক সময় কাজ থেকে বিচ্যুত করে অথবা কাজের সময় অপচয় করে। এ ধরণের যোগাযোগ বা তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পিতভাবে এসব উপকরণগুলো ব্যবহার করতে হবে।

৯. **বহুমূখী কাজ:** আন্তঃবিভাগের কাজের সুনির্দিষ্টকারী এবং সময় নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে বহুমূখী কাজ পরিহার করা সময়ের যথাযথ ব্যবহারের উপরই নির্ভর করে একজন ব্যবস্থাপক বা প্রশাসকের সাফল্য।

১০. **সময়মতো কার্য-সম্পাদন:** "এখনই" করতে হবে এ প্রক্রিয়াটি সব সময় চেষ্টা করতে হবে। সম্পূর্ণ কাজটি একই সময় করতে না পারলে, সেটাকে সরিয়ে না রেখে, ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা এবং পর্যায়ক্রমে শেষ করা।

১১. **মূল্যায়ন:** সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়মত সম্পন্ন হলো কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ধারাবাহিক ভাবে প্রতিদিন কাজের মান ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং আন্তঃ বিভাগের নির্বাহী ও অধস্তনদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা কতটুকু প্রতিফলিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময় অনুসরণ করছে কিনা? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক হয় তবেই সময় ব্যবস্থাপনার সার্থক রূপ দেবে। সময়ের যথাযথ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে একজন ব্যবস্থাপক বা প্রশাসকের সাফল্য।

## গ. উপস্থাপন (Presentation)

প্রতিষ্ঠানের বিভাগ ও উপ-বিভাগ নির্বাহী ও অধস্তনদের আন্তঃ বিভাগীয় কার্যের সমন্বয় সাধনে নির্বাহীদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই সমন্বয় সাধনে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনে দলীয় কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালনা করতে হয়। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধান, সভা পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাস্তবায়নে উপস্থাপনে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অধস্তনের প্রতিষ্ঠানে কার্য প্রণালী রূপরেখা তৈরি এবং প্রতিষ্ঠানে উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে রূপরেখা উপস্থাপন করতে হয়। তাই কার্যকর উপস্থাপনের কলাকৌশল উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থাপনা অন্যতম ভূমিকা রাখে। উপস্থাপনের দক্ষতা সমূহ নিম্নে দেয়া হলো:

১. **চিত্তাকর্ষক উপস্থাপন:** প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের কর্মপ্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক অধস্তনদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও চিত্তরঞ্জন হওয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং বিষয়বস্তু রসালো উপস্থাপন। যাতে উপস্থাপন সাবলীল, সহজ ও বোধগম্যতা হয় সে দিকে নির্বাহীদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. **প্রস্তুতি:** প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপনের জন্য নীতি, বিধিমালা অনুযায়ী উপস্থাপনযোগ্য বিষয় র্নিধারণ করা এবং সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে সহায়ক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে উপস্থাপনের পূর্বে অনুশীলন করতে হবে।

৩. **কণ্ঠস্বর:** উপস্থাপনে বিষয়বস্তু অধস্তনদের বা শ্রোতাদের কাছে যেন সুস্পষ্ট হয় এবং শুনতে পান সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে স্পষ্টভাবে উচ্চারণের ও কণ্ঠস্তরের অনুশীলন করা দরকার হতে পারে।

৪. **বিষয়ানুগতা:** উপস্থাপনের দক্ষতা অর্জনের অন্যান্য দিকের মধ্যে বিষয়ানুগতার বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক সময় দেখা যায় কোন বক্তা নির্ধারিত বিষয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যান অথবা বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেন না। কাজেই এই বিশেষ দিকটির প্রতি খেয়াল রেখে বিষয় অনুযায়ী যতটুকু বলা প্রয়োজন তাই বলার অনুশীলন করতে হবে।

৫. **বাচনভঙ্গি:** উপস্থাপনের জন্য সুন্দর বাচনভঙ্গি দরকার। বক্তব্য সুন্দর করার জন্য প্রতিশব্দ ও উদ্বৃতি ব্যবহার করা যায়। কথা বলার সময় মনে রাখতে হবে একঘেয়ে কথা বা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। কেউ আঘাত পায় বা বিরক্ত হয় বা মূল্যবোধে বিঘ্নিত হয় এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকা। প্রয়োজনে অনুশীলন করার মাধ্যমে উপস্থঅপনের দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

৬. **প্রযুক্তি ব্যবহার:** তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেটেশন বা ওভার হেড প্রজেক্টর ব্যভহার, চার্ট, ফ্ল্যাশকার্ড ও কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে।

৭. **প্রশ্ন-উত্তর:** বক্তব্য উপস্থাপনের পর শ্রোতা বা অধস্তনদের কাছ থেকে কোন বিষয় স্পষ্টতা জানতে চাইলে ইতবিাচক ভূমিকা রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে উত্তর প্রদান করতে হবে।

৮. **পরিবেশ:** সভা কক্ষে বা বক্তব্য কক্ষের সুবিধা ও অসুবিধা বা উপস্থাপনের সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারে ত্রুটি বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়ার সামর্থ্য উপস্থাপকের থাকতে হবে। উপস্থাপনের পরিবেশ ব্যবস্থা করার দক্ষতা থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় আন্তঃবিভাগে সমন্বয় সাধনে উপস্থাপন দক্ষতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করে তুলতে সহায়তা করে।

## ঘ. দলগঠন (Team Building)

আন্তঃবিভাগের কার্যাদি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য দল গঠন করতে হয়। এখানে দল গঠন বলতে প্রতিষ্ঠানের কতিপয় সদস্যের একটি দল যারা কোনো বিশেষ বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মিলিত হয়। আবার অন্যভাবে বলা যায় একদল লোকের সমষ্টি যাদের উপর বিশেষভাবে প্রশাসনিক কার্য-সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে দলীয় কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করে তুলতে সাহায্য করে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে অধীনস্ত উপ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমন্বয় বিধান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দল গঠনের প্রযোজনীয়তা দেখা দেয়। আবার এই দল গঠন অনেকে কমিটি গঠন নামেও অভিহিত করে থাকেন। এরূপ দল গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সভাপতি বা সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং সমান্তরাল বিভাগসমূহের নির্বাহীগণ সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। মাঝে মধ্যে বা নিয়মিতভাবে এরূপ দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভাগ সমূহের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা পর্যালোচনা করা হয় এবং পারস্পরিক কাজের মধ্যে সমন্বয় বিধানে প্রয়াস চালানো হয়। আবার উপ বিভাগের বা প্রতিষ্ঠানের কার্য-সম্পাদনে বিভিন্ন কার্য-সম্পাদনে উপ দল গঠন করতে হয়। এসব দলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা

সম্পন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে দল গঠন করে থাকে। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্য-সম্পাদনে দায়িত্ব দল বা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ দল গঠন ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এর ভিত্তি করে কোন বিষয়ে পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সরল রৈখিক ও বিশেষজ্ঞতার সমন্বয়ে দল গঠন করতে হয়। এরূপ দল বা কমিটি বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধস্তন কর্মীদের আদেশ-নির্দেশ দিয়ে থাকে। এ সমস্ত দল গঠনের ক্ষেত্রে দলের সদস্য নির্বাচনে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। অর্থাৎ দলগত ব্যবস্থাপনায় মূল ভূমিকা সভাপতি/সমন্বয়কারী থাকে।

## চ. চুক্তিপূর্ব আলাপ-আলোচনা (Negotitation)

কোনো প্রতিষ্ঠানের দলে অথবা দলের বাহিরে দলীয় উদ্দেশ্য হাসিলের তাগিদে দলনেতা বা মনোনীত দলীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্ধারিত সমস্যা সমাধানকল্পে চুক্তিপূর্ণ আলোচনা বা সমঝোতা করতে হয় বা Negotiation করতে হয়। আন্তঃবিভাগীয় প্রতিটি বিভাগের কর্মীদের মধ্যে অনেক সময় মতভেদ সৃষ্টি হয়, ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, দলের সাথে দলের অন্য সদস্যদের মতবিরোধ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে থাকে। এ ধরণের সমস্যাকে সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠানে প্রধানদের সমন্বয় সাধন করতে হয়। আবার প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্য প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বা বহিস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বার্থ হাসিলের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে আলোচনা করতে হয়। চুক্তি পর্ব আলোচনা এরূপ সমস্যা সমাধান একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। চুক্তি পূর্ব আলোচনা (Negotiation)-এর ক্ষেত্রে সাধারণত নিচের কাজগুলো করতে হয়।

- সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা।
- বিরোধ বা মতভেদ বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য লক্ষ্য (Target) র্নিধারণ করা।
- সমঝোতার জন্য দ্বিপাক্ষিকতা সদস্যদের চিহ্নিত করা।
- মতৈক্যতার বা বিরোধ বা মতভেদের কারণসমূহ চিহ্নিত করা।
- চুক্তির রূপরেখা চিহ্নিত করা অর্থাৎ আলাপ আলোচনা যাতে সংক্ষিপ্ত বা সুনির্দিষ্টকরণ করা।
- উভয় পক্ষের আলোচনার সূত্র ধরে খসড়া প্রস্তুত করা।
- সময়সীমা, স্থান ও প্রতিনিধি নির্বাচন করা।
- প্রতিনিধির দায়িত্ব অর্পন।
- চূড়ান্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া।

তাছাড়া চুক্তি পূর্ব আলোচনা বা Negotiation ফলপ্রসূ করার পূর্বশর্ত হলো–

- দ্বিপাক্ষিক দলের মতামত সতর্কতা সাথে শ্রবণ করা।
- দলের সদস্যদের দৃষ্টি ভঙ্গির সম্ভাব্যতা যাচাই করা।
- দলের সদস্যদের শান্ত করার সামর্থ্য থাকা।
- বিভিন্ন সমাধানে পথ বের করার চেষ্টা করা।
- নিরপেক্ষ সমাধানে ব্রত থাকা।
- আপত্তি মীমাংসা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- উভয় পক্ষের মধ্যে স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার প্রবণতা থাকার জন্য প্রভাব বিস্তার করা।

পরিশেষে বলা যায় আন্তঃবিভাগীয় বিভিন্ন দলের মধ্যে উপরোক্ত কার্যধাপ সম্পন্ন করার পরে উভয় পক্ষের সম্মিলিত এবং সহযোগিতায় পরিপূর্ণ চুক্তি কার্য সম্পন্ন হয়। এ চেতনা জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ হাসিলের জন্য বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কারণ চুক্তিপূর্ব আলাপ-আলোচনা কার্যক্রমের ফল

প্রসূতায় শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষ্যভিত্তিক চুক্তি করা হয় যা কেন্দ্রীয় নির্বাহীর সম্মতিতে। যার কার্যক্রম পরবর্তীতে বাস্তবায়ন উদ্যোগ নেয়া হয়। তাই আন্তঃ বিভাগের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সমন্বয় সাধনে চুক্তিপূর্ব আলোচনায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপকে কার্যকর করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

## উপসংহার

একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তঃবিভাগীয় কাজের সুষ্ঠ সমাধানে সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা প্রধান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা সমন্বয়কারী আন্তঃবিভাগের কাজের সমন্বয় সাধানে নিয়মিত সভা পরিচালনা, সময় ব্যবস্থাপনা, সভায় কাজের উপস্থাপন, দলগঠন ও চুক্তিপূর্ব আলোচনা করার সামর্থ্য অর্জন করতে হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

### ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. কোনো প্রতিষ্ঠানে কত ধরণের সভা অনুষ্ঠিত হয়?
   ক. ৩
   খ. ৪
   গ. ৫
   ঘ. ৬

২. সভা কতটি পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হয়?
   ক. ২
   খ. ৩
   গ. ৪
   ঘ) ৫

৩. কার্য-সম্পাদনে সময় নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকরি কৌশলসমূহ-
   i. গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী
   ii. গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জরুরী নয়
   iii. তথ্যের জন্য সময়
   **নীচের কোনটি সঠিক?**
   ক. i ও ii
   খ. ii ও iii
   গ. i ও iii
   ঘ. i, ii ও iii

৪. আন্তঃ বিভাগীয় কাজের সমন্বয় সাধনে দল গঠনের প্রয়োজন-
   i. দ্রুত কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   ii. উদ্ভুদ সমস্যা সমাধান
   iii. বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমতা বিধান

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৫. চুক্তিপর্ব আলাপ-আলোচনা (Negotiation) গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ-

i. মতভেদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ

ii. মতভেদের কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

iii. দ্বন্দ্বের কৌশল নির্ধারণ করা।

**নীচের কোনটি সঠিক?**

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

**উত্তরমালা: ১.** গ, ২. খ, ৩. খ, ৪. ঘ, ৫. খ

## খ. সংক্ষিপ্তমূলক প্রশ্ন

১. সভা কী?

২. সভা পরিচালনায় পর্যায়সমূহ লিখুন।

৩. সময় ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

৪. সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল সমূহ লিখুন।

৫. উপস্থাপনে দক্ষতা সমূহ লিখুন।

৬. দলগঠনের প্রয়োজন কেন?

৭. কার্যকরী দল গঠনের দলের সদস্যদের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৮. চুক্তিপূর্ব আলাপ-আলোচনার কাজগুলো লিখুন।

## গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সভা পরিচালনা পর্যায়সমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২. আন্তঃবিভাগের সভা পরিচালনা কীভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় সে ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।

৩. সময় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের কৌশলগুলো কতটুকু কার্যকর বলে আপনি মনে করেন? সে ক্ষেত্রে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

৪. প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীর উপস্থাপনে দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ কেন? দক্ষতা অর্জনের কৌশলগুলো বর্ণনা করুন।

৫. আন্তঃবিভাগের কাজের সমন্বয় সাধনে দলগঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- ব্যাখ্যা করুন।

৬. বেলবিনসের দলের সদস্যদের ভূমিকা চিহ্নিত করে দলগঠন এর প্রক্রিয়া কতটুকু ফলপ্রসূ হয় সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৭. চুক্তি পূর্ব আলোচনা (Negotiation) একজন নির্বাহী কার্য-সম্পাদিত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।